EHSANUL HOQUE SAJID

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর জীবন

জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত
৩৫ পর্বে ধারাবাহিক সীরাত

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর জীবন

৩৫ পর্বে ধারাবাহিক সীরাত

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

এআই সহায়তায় প্রস্তুত; সম্পাদনা ও যাচাই: ইহছানুল হক ছাজিদ

সূচিপত্র

প্রথম পর্যায় — নবুওয়াতের পূর্বে

পর্ব ১–৪

১ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে আলোর প্রতীক্ষা ৬

২ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশপরিচয়, জন্ম এবং শৈশব ৯

৩ তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ ১১

৪ কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ, হাজরে আসওয়াদ স্থাপন এবং হেরা গুহায় নির্জন চিন্তায় নিমগ্ন মুহাম্মাদ ﷺ ১৪

দ্বিতীয় পর্যায় — মক্কী জীবন

পর্ব ৫–১৬

৫ হেরা গুহায় প্রথম ওহি ১৮

৬ ওহির বিরতি, "হে চাদরাবৃত!"—নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দাওয়াতের সূচনা ২২

৭ গোপন দাওয়াতের সূচনা ২৫

৮ সাফা পাহাড়ের আহ্বান ২৭

৯ কুরাইশদের নির্যাতনের সূচনা ৩০

১০ হাবশায় হিজরত ৩৩

১১ কুরাইশদের আপসের প্রস্তাব, সূরা আল-কাফিরূন এবং তাওহীদের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিচল অবস্থান ৩৭

১২ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট ৪০

১৩ শোকের বছর ৪৩

১৪ ইসরা ও মি'রাজ ৪৬

১৫ ইয়াসরিবের নতুন আশা ৫০

১৬ হিজরতের সূচনা ৫৪

তৃতীয় পর্যায় — মাদানী জীবন

পর্ব ১৭–৩৫

১৭ মদিনায় আগমন ৫৮

১৮ মুহাজির ও আনসারের ভ্রাতৃত্ব, মদিনা সনদ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন ৬১

১৯ কিবলা পরিবর্তন, রমজানের রোজা ফরজ এবং বদরের যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি ৬৪
২০ বদরের যুদ্ধ ৬৭
২১ বদরের পরিণতি ৭১
২২ উহুদের যুদ্ধ ৭৪
২৩ উহুদের পরবর্তী ঘটনা ৭৭
২৪ বানু নাদিরের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের নির্বাসন এবং মদিনার নিরাপত্তা রক্ষায় রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব ৮০
২৫ খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব) ৮৪
২৬ বানু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গ, তাদের বিচার এবং মদিনায় অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের অবসান ৮৮
২৭ হুদাইবিয়ার সন্ধি ৯১
২৮ খাইবার বিজয় ৯৫
২৯ বিশ্বের শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত ৯৯
৩০ মু'তার যুদ্ধ ১০৩
৩১ মক্কা বিজয় ১০৭
৩২ হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অভিযান ১১১
৩৩ তাবুক অভিযান ১১৫
৩৪ বিদায় হজ ও বিদায় ভাষণ ১১৯
৩৫ রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর অসুস্থতা, শেষ উপদেশ, ইন্তিকাল এবং মানবজাতির জন্য রেখে যাওয়া চিরন্তন আদর্শ ১২৩

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

পর্ব অনুযায়ী সূত্রের তালিকা ১২৮

প্রথম পর্যায়

নবুওয়াতের পূর্বে

আরবের অবস্থা, জন্ম, তারুণ্য ও নির্জন চিন্তা

পর্ব ১ – ৪

পর্ব

১

জাহিলিয়াতের অন্ধকারে আলোর প্রতীক্ষা

শেষ নবীর আগমনের পূর্বে আরবের বাস্তব চিত্র

পৃথিবীতে এমন কিছু সময় এসেছে, যখন সত্যের আলো মানুষের হৃদয় থেকে প্রায় নিভে গিয়েছিল। নবীদের শিক্ষা মানুষ ভুলে গিয়েছিল, তাওহীদের পরিবর্তে শিরক স্থান করে নিয়েছিল, আর ন্যায়বিচারের বদলে অন্যায় ও জুলুম সমাজকে গ্রাস করেছিল। এমনই এক সময়ে আরব উপদ্বীপে মানুষের জীবন ছিল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইতিহাস সেই সময়কে 'জাহিলিয়াতের যুগ' নামে স্মরণ করে।

তবে এই অন্ধকারের মাঝেও কিছু মানুষ ইবরাহিম (আ.)-এর তাওহীদের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল খুবই কম। অধিকাংশ মানুষ কাবাঘরকে ঘিরে শত শত মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেগুলোরই উপাসনা করত।

আল্লাহ বলেন,

> "অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে শরিকও করে।"
>
> — সূরা ইউসুফ, ১২:১০৬

কাবা ছিল তাওহীদের কেন্দ্র। ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) আল্লাহর নির্দেশে এটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সময়ের প্রবাহে মানুষ সেই ঘরকে মূর্তিপূজার কেন্দ্রে পরিণত করল। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, কাবার চারপাশে প্রায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। মানুষ তাদের কাছে সাহায্য চাইত, মানত করত এবং কুরবানি দিত।

শুধু ধর্মীয় অবক্ষয়ই নয়, নৈতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত করুণ। শক্তিশালী গোত্র দুর্বলদের ওপর জুলুম করত। সামান্য বিষয় নিয়ে বছরের পর বছর যুদ্ধ চলত। সুদ, মদ, জুয়া ও ব্যভিচার সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নারীদের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের উত্তরাধিকারের অধিকার ছিল না, বরং তাদের সম্পদের মতো বিবেচনা করা হতো। কোনো কোনো গোত্র কন্যাসন্তান জন্মকে লজ্জার বিষয় মনে করত এবং জীবন্ত কবর দিয়ে দিত।

আল্লাহ সেই নির্মম দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

> "যখন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাশিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে—কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?"
>
> — সূরা আত-তাকভীর, ৮১:৮–৯

তবে এই অন্ধকারের মাঝেও কিছু সুন্দর গুণ ছিল। আরবরা অতিথিপরায়ণ ছিল, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত, সাহসী ছিল এবং কবিতা ও ভাষার সৌন্দর্যে অনন্য ছিল। আল্লাহ পরবর্তীতে এই গুণগুলোকে ইসলামের আলোয় পরিশুদ্ধ ও পূর্ণতা দান করেন।

এমন এক সময়ে মানবজাতির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল একজন পথপ্রদর্শকের—যিনি মানুষকে আবার এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনবেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং মানবতার প্রকৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দেবেন।

আল্লাহ বলেন,

> "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।"
>
> — সূরা আল-জুমু'আহ, ৬২:২

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

> — সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৭

অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন ছিল কেবল একজন মানুষের জন্ম নয়; এটি ছিল অন্ধকার পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের সূর্যোদয়। তাঁর মাধ্যমে মানুষ আবার তাওহীদের পথে ফিরে এল, জুলুমের পরিবর্তে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো এবং বিভক্ত জাতিগুলো ঈমানের বন্ধনে একত্রিত হলো।

জাহিলিয়াতের সেই অন্ধকার যত গভীর ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের আলো ততই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই তাঁর জীবন বোঝার আগে সেই যুগকে জানা জরুরি। কারণ অন্ধকারকে না জানলে আলোর মূল্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশপরিচয়, জন্ম এবং শৈশব —যে ঘর থেকে মানবতার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শকের আবির্ভাব।

পর্ব

২

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর বংশপরিচয়, জন্ম এবং শৈশব

আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর নবীদের মানবজাতির মধ্য থেকেই নির্বাচন করেছেন। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم-কে তিনি এমন এক সম্মানিত বংশে জন্ম দিয়েছিলেন, যার শিকড় গিয়ে মিলে নবী ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর সঙ্গে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্য থেকে কিনানাহ গোত্রকে নির্বাচন করেছেন। কিনানাহ থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বানু হাশিমকে এবং বানু হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৭৬

তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব, আর মাতার নাম আমিনা বিনতে ওহব। তিনি জন্মগ্রহণের আগেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তিনি জন্ম থেকেই এতিম ছিলেন। আল্লাহ পরবর্তীতে এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

> "তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আশ্রয় দেননি ?"
>
> — সূরা আদ-দুহা, ৯৩:৬

হাতিওয়ালাদের আক্রমণের যে বছর আল্লাহ কাবাঘরকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছিলেন, সেই আমুল ফীল (হাতির বছর)-এই রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, এটি খ্রিস্টীয় ৫৭০ বা ৫৭১ সালের ঘটনা। তাঁর জন্মের সঠিক দিন নিয়ে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ আলিমের মতে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তবে

১২ রবিউল আউয়াল-কে জন্মদিন হিসেবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার মতো সহিহ দলিল নেই। তাই এ বিষয়ে নিশ্চিত দাবি করা উচিত নয়।

শৈশবে আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর একটি রীতি ছিল, নবজাতকদের মরু অঞ্চলের বিশুদ্ধ পরিবেশে লালন-পালনের জন্য দুগ্ধমাতার কাছে পাঠানো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও হালিমা আস-সা'দিয়্যা (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন।

হালিমা (রা.) পরে বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁদের ঘরে আসার পর থেকেই আল্লাহ তাঁদের জীবনে বরকত দান করতে শুরু করেন। শুকিয়ে যাওয়া পশু দুধ দিতে লাগল এবং দারিদ্র্যের পরিবর্তে স্বচ্ছলতা দেখা দিল। এসব ঘটনা নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

শৈশবেই আল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে হেফাজত করেছেন। সহিহ হাদিসে এসেছে, একদিন জিবরীল (আ.) এসে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেন, অন্তর থেকে শয়তানের অংশ অপসারণ করেন এবং তা জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে দেন। তারপর তাঁর বক্ষ আগের মতো করে দেওয়া হয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬২)

এ ঘটনা ছিল তাঁর নবুওয়াতের প্রস্তুতির একটি বিশেষ নিদর্শন।

কিছুদিন পর তিনি তাঁর মায়ের কাছে ফিরে আসেন। ছয় বছর বয়সে মা আমিনা তাঁকে নিয়ে মদিনায় আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে আমিনা ইন্তিকাল করেন। এত অল্প বয়সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মাতৃহীনও হয়ে গেলেন।

এরপর তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহে লালন-পালন করেন। কিন্তু দুই বছর পর তিনিও ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজের সন্তানের মতোই তাঁকে ভালোবাসতেন।

একের পর এক এত বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়েও আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে কখনো একা ছেড়ে দেননি। তিনি নিজেই তাঁর প্রতিপালক, রক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শৈশব আমাদের শেখায়, দুনিয়ার কষ্ট ও পরীক্ষার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ কাউকে ভালোবাসেন না। বরং অনেক সময় সবচেয়ে প্রিয় বান্দারাই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। আল্লাহ তাঁদেরকে ধৈর্য, ঈমান ও তাঁর ওপর নির্ভরতার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন।

এ জীবন আরও শেখায়, মানুষের প্রকৃত আশ্রয় কোনো ব্যক্তি নয়; একমাত্র আল্লাহ। পিতা, মাতা, দাদা—সবাই একে একে চলে গেলেও আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে কখনো পরিত্যাগ করেননি।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ: তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ: আল-আমীন উপাধি, ব্যবসায় সততা এবং খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বরকতময় বিবাহ।

পর্ব

৩

তরুণ মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم

আল-আমীন উপাধি, ব্যবসায় সততা এবং খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বরকতময় বিবাহ

শৈশবে পিতা, মাতা ও দাদাকে হারানোর পর মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم তাঁর চাচা আবু তালিবের স্নেহে বেড়ে উঠলেন। আবু তালিব ধনী ছিলেন না। তাই ছোটবেলা থেকেই রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم পরিশ্রমের মূল্য বুঝেছিলেন।

তিনি কিছু সময় মক্কার মানুষের ছাগল চরাতেন। পরে তিনি বলেন,

> "আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল চরাননি।" সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিও?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমিও মক্কার লোকদের ছাগল কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চরাতাম।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২২৬২

এই কাজ তাঁর মধ্যে ধৈর্য, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বের গুণ গড়ে তুলেছিল।

যৌবনে তিনি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। সে সময় আরবের ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতারণা, মিথ্যা শপথ ও অসততা সাধারণ বিষয় ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, কারও হক নষ্ট করতেন না এবং আমানতের খিয়ানত করতেন না।

তাঁর এই অসাধারণ চরিত্রের কারণে মক্কার মানুষ তাঁকে "আল-আমীন" (বিশ্বস্ত) এবং "আস-সাদিক" (সত্যবাদী) নামে ডাকত।

আল্লাহ পরবর্তীতে তাঁর এই মহান চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন,

> "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"
>
> — সূরা আল-কলম, ৬৮:৪

মক্কার সম্মানিত ও ধনী ব্যবসায়ী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) মুহাম্মাদ ﷺ-এর সততা ও বিশ্বস্ততার কথা শুনেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবসায়িক কাফেলার দায়িত্ব মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাতে অর্পণ করেন।

মুহাম্মাদ ﷺ সিরিয়ার দিকে বাণিজ্য সফরে গেলেন এবং অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করলেন। খাদিজা (রা.)-এর খাদেম মাইসারাও তাঁর অসাধারণ চরিত্র, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম আচরণের কথা ফিরে এসে বর্ণনা করেন। নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে এসব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এরপর খাদিজা (রা.) নিজেই বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেন। উভয় পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের সময় মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স ছিল ২৫ বছর, আর খাদিজা (রা.)-এর বয়স সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ৪০ বছর, যদিও কিছু গবেষক এর চেয়ে কম বয়সও উল্লেখ করেছেন। তাই এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

এই বিবাহ ছিল ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বস্ততা ও পারস্পরিক সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

খাদিজা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করেননি। প্রায় পঁচিশ বছর তাঁরা একসঙ্গে সংসার করেছেন।

আল্লাহ তাঁদের ঘরকে বরকতময় করেছিলেন। তাঁদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন কাসিম, যায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা (রা.) এবং আবদুল্লাহ (তাইয়্যিব/তাহির)।

পরবর্তীকালে নবুওয়াতের সবচেয়ে কঠিন সময়ে খাদিজা (রা.)-ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো তাঁর এই অবদান ভুলে যাননি। বহু বছর পরও তিনি খাদিজা (রা.)-এর কথা গভীর ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করতেন।

তিনি বলেছেন,

> "তিনি তখন আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল; তিনি আমাকে সত্যবাদী বলেছিলেন, যখন মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল; তিনি তাঁর সম্পদ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন, যখন মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছিল।"
>
> — মুসনাদ আহমাদ; এর অর্থ সহিহ বর্ণনাসমূহ দ্বারা সমর্থিত

তরুণ মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم-এর জীবন আমাদের শেখায়, প্রকৃত সম্মান সম্পদ বা বংশে নয়; সততা, বিশ্বস্ততা ও উত্তম চরিত্রে। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে বছরের পর বছর লাগে, কিন্তু অসততা সেই বিশ্বাস মুহূর্তেই নষ্ট করে দিতে পারে।

তাঁর জীবন আরও শেখায়, একটি নেক ও পরস্পরের সহযোগিতাপূর্ণ পরিবার একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামতগুলোর একটি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গড়ে ওঠা সংসার দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জীবনের কল্যাণের মাধ্যম।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ: কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ, হাজরে আসওয়াদ স্থাপন এবং হেরা গুহায় নির্জন চিন্তায় নিমগ্ন মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم।

পর্ব

৪

কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ, হাজরে আসওয়াদ স্থাপন এবং হেরা গুহায় নির্জন চিন্তায় নিমগ্ন মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم

যৌবনে মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم সততা, বিশ্বস্ততা এবং উত্তম চরিত্রের জন্য মক্কার মানুষের কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে আরও বড় একটি দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করছিলেন—সমগ্র মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব।

নবুওয়াতের কয়েক বছর আগে মক্কায় প্রবল বন্যায় কাবাঘরের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নিল, কাবাঘর নতুন করে নির্মাণ করা হবে। তবে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল, এই নির্মাণকাজে কোনো হারাম উপার্জনের অর্থ ব্যবহার করবে না; শুধু বৈধ ও পবিত্র সম্পদই ব্যয় করবে। নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

নির্মাণকাজ শেষ হলে একটি বড় সমস্যা দেখা দিল। হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) কে তার স্থানে স্থাপন করবে—এ নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হলো। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, কয়েক দিন ধরে উত্তেজনা চলল এবং প্রায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিল।

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, পরদিন সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কাবার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবেন, তাঁর সিদ্ধান্তই সবাই মেনে নেবে।

পরদিন সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم।

তাঁকে দেখেই সবাই আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল,

> "এ তো আল-আমীন! আমরা তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।"

মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم এমন একটি সমাধান দিলেন, যা শুধু বিরোধই মিটিয়ে দিল না, বরং সব গোত্রের সম্মানও রক্ষা করল।

তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তার মাঝখানে হাজরে আসওয়াদ রাখলেন। এরপর প্রতিটি প্রধান গোত্রের একজন প্রতিনিধিকে সেই চাদরের একেকটি কোণা ধরতে বললেন। সবাই মিলে পাথরটি নির্ধারিত স্থানের কাছে নিয়ে এলে তিনি নিজ হাতে সেটি তার স্থানে স্থাপন করলেন।

এভাবেই একটি বড় সংঘর্ষ আল্লাহর দেওয়া তাঁর প্রজ্ঞার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হয়ে গেল। নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে এ ঘটনাটি ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم চারপাশের সমাজের অবস্থা দেখে গভীরভাবে ব্যথিত হতে লাগলেন। মূর্তিপূজা, অন্যায়, সুদ, ব্যভিচার, দুর্বলদের ওপর অত্যাচার এবং নৈতিক অবক্ষয় তাঁকে ভাবিয়ে তুলত।

তিনি এসব কাজে কখনো অংশ নেননি। বরং নির্জনে একাকী চিন্তা ও ইবাদত করতে ভালোবাসতেন।

প্রতি বছর তিনি মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় কয়েক দিন অবস্থান করতেন। সেখানে তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন, সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতেন এবং সমাজের এই অন্ধকার থেকে মুক্তির পথ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন।

আয়িশা (রা.) বলেন,

> "রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর কাছে প্রথমে সত্য স্বপ্ন আসতে শুরু করে। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং সেখানে বহু রাত ইবাদত করতেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩

এ সময় তিনি এখনো নবী হননি। কিন্তু আল্লাহ তাঁর হৃদয়কে নবুওয়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

কয়েক মাস ধরে তিনি একইভাবে হেরা গুহায় নির্জনে সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি জানতেন না, খুব শিগগিরই মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত হতে যাচ্ছে।

পৃথিবী অপেক্ষা করছিল সর্বশেষ আসমানি বার্তার জন্য। ফেরেশতা জিবরীল (আ.) অপেক্ষা করছিলেন আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করার জন্য। আর হেরা গুহার সেই নীরব রাতেই শুরু হতে যাচ্ছিল নবুওয়াতের এক নতুন অধ্যায়।

মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم-এর এই জীবনপর্ব আমাদের শেখায়, একজন মুমিনের উচিত কোলাহলপূর্ণ জীবন থেকে কিছু সময় বের করে আত্মসমালোচনা করা, আল্লাহকে স্মরণ করা এবং নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করা।

এ ঘটনাটি আরও শেখায়, একজন প্রকৃত নেতা বা দাঈ মানুষের সমস্যা আরও জটিল করে না; বরং প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ: হেরা গুহায় প্রথম ওহি: "ইকরা"—নবুওয়াতের সূচনা এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহর শেষ বার্তার সূচনা।

দ্বিতীয় পর্যায়

মক্কী জীবন

ওহি, দাওয়াত, নির্যাতন ও হিজরতের সূচনা

পর্ব ৫ – ১৬

পর্ব ৫

হেরা গুহায় প্রথম ওহি

"ইকরা"—যে মুহূর্তে শুরু হলো নবুওয়াত এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহর সর্বশেষ হিদায়াতের যাত্রা

মক্কার নিকটবর্তী জাবালে নূরের চূড়ায় ছোট্ট একটি গুহা—হেরা। দিনের কোলাহল থেকে দূরে, রাতের নিস্তব্ধতায় এখানেই নির্জনে ইবাদত ও গভীর চিন্তায় সময় কাটাতেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি সমাজের শিরক, অন্যায় ও নৈতিক অবক্ষয় দেখে ব্যথিত হতেন। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না, আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন।

তাঁর বয়স তখন চল্লিশ বছর।

রমজান মাসের এক বরকতময় রাতে হেরা গুহায় তিনি ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিবরীল (আ.) আগমন করলেন।

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন,

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রথম যে ওহি আসে, তা ছিল সত্য স্বপ্ন। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং সেখানে বহু রাত ইবাদত করতেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩

এরপর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত উপস্থিত হলো।

জিবরীল (আ.) তাঁকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে বললেন,

> "اقْرَأْ" — "পড়ুন।"

মুহাম্মাদ ﷺ উত্তর দিলেন,

> "আমি পড়তে জানি না।"

ফেরেশতা আবার তাঁকে জড়িয়ে ধরে একই কথা বললেন,

> "পড়ুন।"

তিনি আবারও বললেন,

> "আমি পড়তে জানি না।"

তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটল। এরপর জিবরীল (আ.) আল্লাহর প্রথম ওহি পাঠ করলেন—

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

অর্থ

"পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"

— সূরা আল-আলাক, ৯৬:১–৫

এই পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমেই শুরু হলো আল-কুরআনের অবতরণ এবং নবুওয়াতের সূচনা।

ওহির এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। দ্রুত হেরা গুহা থেকে নেমে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

তিনি বললেন,

> "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!"

খাদিজা (রা.) তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি পুরো ঘটনাটি খুলে বললেন এবং বললেন,

> "আমি আমার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।"

তখন খাদিজা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ইতিহাসের এক অমর সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

তিনি বললেন,

> "কখনোই নয়! আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলদের সাহায্য করেন, অভাবীদের দান করেন, অতিথির সম্মান করেন এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে মানুষকে সহযোগিতা করেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬০

এরপর খাদিজা (রা.) তাঁকে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফাল-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন।

সবকিছু শোনার পর ওয়ারাকা বললেন,

> "এ তো সেই নামূস (জিবরীল), যিনি মূসা (আ.)-এর কাছেও এসেছিলেন। হায়! আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার জাতি আপনাকে বের করে দেবে!"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত হয়ে বললেন,

> "তারা কি আমাকে বের করে দেবে ?"

ওয়ারাকা বললেন,

> "হ্যাঁ। যে-ই আপনার মতো বার্তা নিয়ে এসেছে, তারই বিরোধিতা করা হয়েছে।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩

সেদিন হেরা গুহায় শুধু একজন মানুষের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়নি; শুরু হয়েছিল মানবজাতির জন্য আল্লাহর সর্বশেষ হিদায়াতের যাত্রা। পরবর্তী তেইশ বছর ধরে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয় আল-কুরআন—যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য পথনির্দেশ।

আল্লাহ বলেন,

> "এটি এমন এক কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; মুত্তাকিদের জন্য এটি হিদায়াত।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২

হেরা গুহার সেই রাত আমাদের শেখায়, ইসলামের প্রথম নির্দেশ ছিল "পড়ুন"। জ্ঞান, শিক্ষা ও আল্লাহর পরিচয়—এই তিনটি বিষয়ই ইসলামের ভিত্তি। আবার এটি শেখায়, একজন নেক জীবনযাপনকারী মানুষকে আল্লাহ কঠিন সময়েও একা ছেড়ে দেন না। যেমন খাদিজা (রা.) তাঁর স্বামীকে সাহস ও সমর্থন দিয়েছিলেন, তেমনি আল্লাহও তাঁর প্রিয় রাসূলকে নিজের হেফাজতে রেখেছিলেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ওহির বিরতি, "ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির" এবং প্রকাশ্যে নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণের সূচনা।

পর্ব



ওহির বিরতি, "হে চাদরাবৃত!"—নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দাওয়াতের সূচনা

হেরা গুহায় প্রথম ওহি নাযিল হওয়ার পর মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন চিরদিনের জন্য বদলে গেল। তিনি আর শুধু মক্কার একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী ছিলেন না; এখন তিনি আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ রাসূল।

প্রথম ওহির পর কিছু সময় ওহি অবতরণ বন্ধ থাকল। এই সময়কে "ফাতরাতুল ওহি" (ওহির বিরতি) বলা হয়।

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রথম ওহির পর কিছুদিন ওহি বন্ধ ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীরভাবে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে পরিত্যাগ করেননি; বরং এই বিরতির মাধ্যমে তাঁর অন্তরকে আরও দৃঢ় ও প্রস্তুত করছিলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৯৮২)

একদিন তিনি মক্কার বাইরে থেকে ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন —হেরা গুহায় যিনি এসেছিলেন, সেই ফেরেশতা জিবরীল (আ.) আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক বিশাল আসনে বসে আছেন।

এই দৃশ্য দেখে তিনি ভীত হয়ে দ্রুত বাড়িতে ফিরে এলেন এবং বললেন,

> "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!"

তখন আল্লাহ তাঁর ওপর নতুন ওহি নাযিল করলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَأَنذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

অর্থ

"হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন। আপনার প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।"

— সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪:১–৫

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন—এখন বিশ্রামের সময় নয়; এখন মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার সময়।

এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ওহি অবতরণ শুরু হয় এবং আর দীর্ঘ বিরতি ঘটেনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম দায়িত্ব ছিল মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা।

আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন,

> "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দিন।"
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৬৭

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, যেমন দৃঢ়সংকল্প নবীরা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"
>
> — সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, এই পথ সহজ হবে না। সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, অন্যায়ের বিরোধিতা করতে হবে এবং মানুষকে সত্যের পথে ডাকতে হবে। তবুও তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করেননি।

এই সময় তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলেন খাদিজা (রা.)। তিনি সর্বদা স্বামীকে সাহস দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে উৎসাহিত করতেন।

ওহির বিরতির ঘটনায় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। কখনো কখনো একজন মুমিনের জীবনেও এমন সময় আসে, যখন সে মনে করে আল্লাহর সাহায্য দেরি হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরিত্যাগ করেন না; বরং উপযুক্ত সময়ে আরও বড় দায়িত্ব বা অনুগ্রহের জন্য প্রস্তুত করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের এই অধ্যায় আরও শেখায়, ঈমান শুধু অনুভূতির বিষয় নয়; এটি দায়িত্বেরও নাম। সত্য জানার পর তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নবীদের পথ, আর সেই পথেই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমগ্র জীবন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

গোপন দাওয়াতের সূচনা: সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীরা এবং দারুল আরকামে ঈমানের প্রথম পাঠ।

পর্ব

৭

গোপন দাওয়াতের সূচনা

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীরা এবং দারুল আরকামে ঈমানের প্রথম পাঠ

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভের পর রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করেননি। আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী, প্রথমে এমন একটি ঈমানদার দল গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যারা সত্যের পথে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে।

তাই প্রথম কয়েক বছর তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকেন।

সবার আগে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন তাঁর প্রিয় স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)। তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর মুক্তদাস যায়েদ ইবন হারিসা (রা.), তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবন আবি তালিব (রা.), যিনি তখন কিশোর ছিলেন, এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)।

আবু বকর (রা.) ছিলেন মক্কার অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের বন্ধু ও পরিচিতদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে শুরু করেন।

তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন এমন কয়েকজন মহান সাহাবি হলেন—উসমান ইবন আফফান (রা.), যুবাইর ইবন আওয়াম (রা.), আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.), সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.)। নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে এ ঘটনাগুলো উল্লেখ রয়েছে।

এভাবে ধীরে ধীরে একটি ছোট কিন্তু দৃঢ় ঈমানদার দল গড়ে উঠতে লাগল।

তখনও মক্কার অধিকাংশ মানুষ জানত না যে, তাদের মধ্যেই আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল দাওয়াতের কাজ শুরু করেছেন।

যখন মুসলিমের সংখ্যা কিছুটা বাড়ল, তখন তাদের জন্য নিরাপদে একত্র হওয়ার একটি স্থানের প্রয়োজন হলো।

এই সময় আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা.) তাঁর ঘর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ইতিহাসে এই ঘর দারুল আরকাম নামে পরিচিত।

এই ঘরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, ঈমানকে দৃঢ় করতেন, আল্লাহর স্মরণে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তাদের চরিত্র গঠনে মনোযোগ দিতেন।

এখানেই ইসলামের প্রথম প্রজন্ম গড়ে উঠেছিল—যাঁদের হাতে পরে আল্লাহ পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ইসলামের আলো পৌঁছে দেন।

আল্লাহ বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন।"
>
> — সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৬

এই প্রাথমিক মুসলিমরা শুধু মুখে ঈমান আনেননি; তাঁরা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

তাঁদের সংখ্যা ছিল অল্প, কিন্তু ঈমান ছিল পাহাড়সম দৃঢ়। সমাজের বিরোধিতা, আত্মীয়দের শত্রুতা কিংবা নির্যাতনের আশঙ্কা—কোনো কিছুই তাঁদের সত্য গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের এই প্রথম অধ্যায় আমাদের শেখায়, একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ার আগে শক্তিশালী ঈমান গড়তে হয়। ইসলামের বিজয় শুরু হয়েছিল কোনো বাহিনী দিয়ে নয়; কয়েকজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

এটি আরও শেখায়, একজন মানুষের আন্তরিক দাওয়াত কত বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। আবু বকর (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারী অনেক সাহাবিই পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
আত্মীয়স্বজনকে প্রকাশ্যে দাওয়াত, সাফা পাহাড়ের আহ্বান এবং কুরাইশদের প্রথম বিরোধিতা।

পর্ব



সাফা পাহাড়ের আহ্বান

প্রকাশ্যে দাওয়াত এবং কুরাইশদের প্রথম বিরোধিতা

প্রায় তিন বছর গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রকাশ্যে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। এখন আর শুধু কয়েকজন মানুষের কাছে নয়, সমগ্র মক্কার সামনে সত্যের আহ্বান পৌঁছে দিতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

> "আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।"
>
> — সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২১৪

অন্যত্র তিনি বলেন,

> "অতএব, আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।"
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৪

আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তাঁর নিকটাত্মীয়দের আহ্বান জানালেন। এরপর তিনি মক্কার সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রকে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানালেন।

মানুষ একে একে সেখানে জড়ো হলো। যারা নিজে আসতে পারেনি, তারা নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল।

সবাই উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> "আমি যদি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের ওপাশে একটি শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?"

তারা সবাই একবাক্যে বলল,

> "হ্যাঁ। আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৭১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২০৮

এটি ছিল তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত জীবনের স্বীকৃতি।

এরপর তিনি বললেন,

> "তাহলে জেনে রাখো, আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন শাস্তির পূর্বে সতর্ককারী। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ইবাদত করো।"
>
> — অর্থগতভাবে সহিহ বর্ণনার সারাংশ

কিন্তু এই সত্যের আহ্বান সবাই গ্রহণ করল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবু লাহাব ক্রোধে বলে উঠল,

> "তোমার ধ্বংস হোক! এ জন্যই কি তুমি আমাদের ডেকেছ?"

এর জবাবে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করলেন—

> "আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার সম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না। অচিরেই সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।"
>
> — সূরা আল-মাসাদ, ১১১:১–৩

এটাই ছিল ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য বিরোধিতা।

এরপর থেকে কুরাইশ নেতারা বুঝতে পারল, মুহাম্মাদ ﷺ শুধু একটি নতুন মতবাদ প্রচার করছেন না; বরং তিনি তাদের শিরক, অন্যায়, সামাজিক বৈষম্য ও মিথ্যা দেবতাদের ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ করছেন।

তারা কখনো তাঁকে কবি বলত, কখনো জাদুকর, কখনো পাগল, আবার কখনো মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিত।

কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

> "আমি অবশ্যই জানি, তারা যা বলে, তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়। অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। আর আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকুন, যতক্ষণ না আপনার কাছে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) আসে।"
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৭–৯৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের বিরোধিতা দেখে দাওয়াত বন্ধ করেননি। তিনি জানতেন, সত্যের পথ কখনো সহজ নয়। পূর্ববর্তী সব নবীকেই বিরোধিতা, উপহাস ও নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

সাফা পাহাড়ের এই ঘটনা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। সত্য প্রচারের জন্য মানুষের প্রশংসা নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টিই হওয়া উচিত একজন দাঈর লক্ষ্য। বিরোধিতা আসবেই, কিন্তু সত্যের দাওয়াত থেমে থাকা উচিত নয়।

এ ঘটনাটি আরও শেখায়, একজন মানুষের উত্তম চরিত্র দাওয়াতের শক্তিশালী ভিত্তি। নবুওয়াতের আগে চল্লিশ বছর মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল-আমীন বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই তাঁর শত্রুরাও তাঁর সত্যবাদিতা অস্বীকার করতে পারেনি।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

কুরাইশদের নির্যাতনের সূচনা: বিলাল (রা.), ইয়াসির পরিবার এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত।

পর্ব



কুরাইশদের নির্যাতনের সূচনা

বিলাল (রা.), ইয়াসির পরিবার এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার অনন্য দৃষ্টান্ত

ইসলামের দাওয়াত যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, কুরাইশ নেতাদের উদ্বেগ ততই বাড়তে লাগল। তারা বুঝতে পারল, এই আহ্বান কেবল নতুন একটি ধর্মীয় মত নয়; এটি মানুষের হৃদয় বদলে দিচ্ছে। ধনী-গরিব, দাস-স্বাধীন, আরব-অনারব—সবাই এক আল্লাহর সামনে সমান—এই শিক্ষা তাদের অহংকার ও স্বার্থের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপহাস করল, অপবাদ দিল এবং নানা প্রলোভন দেখাল। কিন্তু যখন দেখল এসবের কোনো ফল হচ্ছে না, তখন তারা মুসলিমদের ওপর নির্যাতন শুরু করল।

বিশেষ করে যাদের শক্তিশালী গোত্র বা পরিবার ছিল না, তাদের ওপর অত্যাচার ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।

তাদের মধ্যে ছিলেন বিলাল ইবন রাবাহ (রা.)। তিনি ছিলেন উমাইয়া ইবন খালাফের দাস। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মালিক তাঁকে প্রচণ্ড নির্যাতন করত। প্রখর রোদের মধ্যে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে তাঁর বুকের ওপর বিশাল পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো। তারপর বলা হতো, "মুহাম্মাদকে অস্বীকার করো এবং আমাদের উপাস্যদের মেনে নাও।"

কিন্তু বিলাল (রা.)-এর মুখ থেকে বারবার একটি কথাই বের হতো—

> "আহাদ, আহাদ!"
> "তিনি এক, তিনি এক।"

এই এক শব্দেই ফুটে উঠেছিল তাঁর অটল তাওহীদ।

অবশেষে আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭৫৭-এর প্রেক্ষাপট এবং নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ)

আরেকটি পরিবার ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে—ইয়াসির (রা.), তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া (রা.) এবং তাঁদের ছেলে আম্মার ইবন ইয়াসির (রা.)।

তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে নির্মম নির্যাতনের শিকার হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে বলতেন,

> "ধৈর্য ধারণ করো, হে ইয়াসিরের পরিবার! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুত ঠিকানা জান্নাত।"
>
> — সীরাত ইবন হিশামসহ নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে বর্ণিত; এর সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে, তবে ঘটনাটি সীরাতে সুপ্রসিদ্ধ।

সুমাইয়া (রা.) নির্যাতনের মধ্যেও ঈমান থেকে ফিরে আসেননি। অবশেষে আবু জাহল তাঁকে শহীদ করে। তিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

আম্মার (রা.)-এর ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হয়। একপর্যায়ে জীবন রক্ষার জন্য তিনি বাধ্য হয়ে মুখে এমন কিছু কথা বলেন, যা তাঁর অন্তরের ঈমানের বিপরীত ছিল। এতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন।

তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন—

> "যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে—তবে সে নয়, যাকে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় কুফরিকে গ্রহণ করে, তাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ।"
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:১০৬

এ আয়াত মুমিনদের জন্য বড় সান্ত্বনা হয়ে আসে। আল্লাহ মানুষের অন্তরের অবস্থা জানেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কুরাইশদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি। একদিন তিনি কাবার পাশে সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন উকবা ইবন আবি মু'আইত তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা করে। আবু বকর (রা.) দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং বলেন,

> "তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করবে, যিনি শুধু বলেন, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ' ?"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৮৫৬

নির্যাতন যত বাড়ছিল, মুসলিমদের ঈমানও তত দৃঢ় হচ্ছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল, সত্যের পথে পরীক্ষাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ বলেন,

> "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না ?"
>
> — সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৫

মক্কার এই কঠিন দিনগুলো প্রমাণ করে, ঈমানের মূল্য শুধু মুখে উচ্চারণে নয়; প্রয়োজনে তার জন্য ত্যাগ স্বীকারেও।

বিলাল (রা.)-এর "আহাদ, আহাদ", সুমাইয়া (রা.)-এর শাহাদাত এবং ইয়াসির পরিবারের ধৈর্য আমাদের শেখায়—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সহ্য করা কষ্ট কখনো বৃথা যায় না। দুনিয়ার সাময়িক কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের জন্য জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

হাবশায় হিজরত: নির্যাতিত মুসলিমদের প্রথম আশ্রয়, নাজাশির ন্যায়বিচার এবং জাফর ইবন আবি তালিব (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ।

পর্ব

১০

হাবশায় হিজরত

নির্যাতিত মুসলিমদের প্রথম আশ্রয়, নাজাশির ন্যায়বিচার এবং জাফর ইবন আবি তালিব (রা.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

মক্কায় মুসলিমদের ওপর নির্যাতন দিন দিন অসহনীয় হয়ে উঠছিল। কেউ উত্তপ্ত মরুভূমিতে শাস্তি পাচ্ছিলেন, কেউ অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন, আবার কেউ নিজের পরিবার থেকেই নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের প্রতিশোধ নিতে বলেননি; বরং ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শিখিয়েছিলেন।

যখন নির্যাতন চরমে পৌঁছাল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন।

তিনি বললেন,

> "তোমরা হাবশায় চলে যাও। সেখানে এমন একজন রাজা আছেন, যার রাজত্বে কারও প্রতি জুলুম করা হয় না। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বস্তির পথ খুলে না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে অবস্থান করো।"
>
> — সীরাত ইবন হিশামসহ নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে বর্ণিত

এভাবেই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরত সংঘটিত হয়।

প্রথম দলে প্রায় এগারো জন পুরুষ ও চারজন নারী হাবশার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পরে নির্যাতন আরও বেড়ে গেলে দ্বিতীয় দফায় আরও অনেক মুসলিম সেখানে চলে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাফর ইবন আবি তালিব (রা.), যিনি এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন।

হাবশার ন্যায়পরায়ণ খ্রিস্টান শাসক ছিলেন নাজাশি (আসহামা)। কুরাইশ নেতারা মুসলিমদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবি রাবিয়া-কে মূল্যবান উপঢৌকনসহ নাজাশির দরবারে পাঠাল।

তারা নাজাশিকে বলল, মক্কা থেকে কিছু যুবক পালিয়ে এসেছে। তারা নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মও ত্যাগ করেছে, আবার আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তাই তাদের ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

কিন্তু নাজাশি ছিলেন ন্যায়বিচারক। তিনি মুসলিমদের কথা না শুনে কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না।

তিনি জাফর ইবন আবি তালিব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমরা কোন ধর্ম গ্রহণ করেছ, যার কারণে নিজেদের জাতিকেও ছেড়েছ এবং আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি ?"

জাফর (রা.) অত্যন্ত সুন্দরভাবে উত্তর দিলেন,

> "হে রাজা ! আমরা ছিলাম জাহিলিয়াতের মানুষ। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, অশ্লীল কাজ করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করতাম এবং শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলকে নির্যাতন করত। এমন সময় আল্লাহ আমাদের মধ্যেই একজন রাসূল পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে জানতাম। তিনি আমাদের এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন, সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করতে এবং অন্যায় ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দিলেন..."
>
> — মুসনাদ আহমাদ; সীরাত ইবন হিশাম

এরপর নাজাশি বললেন,

"তোমাদের নবীর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কিছু আমাকে শুনাও।"

জাফর (রা.) তখন সূরা মারইয়ামের প্রথম অংশ তিলাওয়াত করলেন, যেখানে মারইয়াম (আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক জন্মের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> "আর কিতাবে মারইয়ামের কথা উল্লেখ করুন, যখন তিনি তাঁর পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একটি স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন..."
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:১৬ থেকে পরবর্তী আয়াতসমূহ

কুরআনের এই আয়াতগুলো শুনে নাজাশির চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তাঁর দরবারের খ্রিস্টান পাদ্রিদের চোখেও পানি চলে এল।

নাজাশি বললেন,

> "আল্লাহর শপথ! এই বাণী এবং ঈসা (আ.)-এর কাছে যা এসেছিল, উভয়ই একই আলোর উৎস থেকে এসেছে।"
>
> — সীরাত ইবন হিশাম

পরদিন কুরাইশের দূতেরা আবার চেষ্টা করল। তারা বলল, মুসলিমরা ঈসা (আ.) সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের বিপরীত।

নাজাশি আবার জাফর (রা.)-কে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমরা ঈসা ইবন মারইয়াম সম্পর্কে কী বিশ্বাস কর?"

জাফর (রা.) বললেন,

> "আমরা তাঁর সম্পর্কে তাই বলি, যা আমাদের নবী আমাদের শিখিয়েছেন—তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক রূহ।"
>
> — সীরাত ইবন হিশাম; অর্থ কুরআনের সূরা আন-নিসা, ৪:১৭১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

এ কথা শুনে নাজাশি মাটি থেকে একটি ছোট কাঠি তুলে নিয়ে বললেন,

> "আল্লাহর শপথ! তোমরা ঈসা সম্পর্কে যা বলেছ, আর সত্যের মধ্যে এই কাঠির সমানও পার্থক্য নেই।"

— সীরাত ইবন হিশাম

এরপর তিনি কুরাইশের দূতদের উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন এবং মুসলিমদের নিরাপদে হাবশায় থাকার অনুমতি দিলেন।

এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবার, যখন মুসলিমরা একটি অমুসলিম দেশের ন্যায়পরায়ণ শাসকের অধীনে নিরাপদে বসবাসের সুযোগ পেলেন।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, ন্যায়বিচার একটি সার্বজনীন মূল্যবোধ। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, তিনি মুসলিম হোন বা না হোন, সত্যের প্রতি সম্মান দেখাতে পারেন।

জাফর (রা.)-এর ভাষণ আরও শেখায়, ইসলামের প্রকৃত পরিচয় হলো—তাওহীদ, উত্তম চরিত্র, ন্যায়বিচার, আমানতদারিতা এবং মানবতার কল্যাণ।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

কুরাইশদের আপসের প্রস্তাব, সূরা আল-কাফিরূন এবং তাওহীদের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর অবিচল অবস্থান।

পর্ব

১১

কুরাইশদের আপসের প্রস্তাব, সূরা আল-কাফিরূন এবং তাওহীদের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিচল অবস্থান

মক্কায় ইসলামের দাওয়াত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। নির্যাতন, উপহাস ও সামাজিক বয়কট—কোনো কিছুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। অন্যদিকে, কুরাইশ নেতারাও বুঝতে পারছিল, শক্তি প্রয়োগ করেও তাঁকে থামানো যাচ্ছে না।

তখন তারা অন্য একটি পথ বেছে নিল—আপসের প্রস্তাব।

তাদের ধারণা ছিল, যদি মুহাম্মাদ ﷺ কিছুটা ছাড় দেন, তাহলে বিরোধও শেষ হয়ে যাবে।

তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল,

"আপনি এক বছর আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করুন, আর এক বছর আমরা আপনার রবের ইবাদত করব। এভাবে আমরা সমঝোতায় পৌঁছে যাব।"

তাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের দাওয়াতকে দুর্বল করে দেওয়া এবং শিরককে বৈধতা দেওয়া।

কিন্তু আল্লাহর দ্বীনে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোনো আপস নেই।

এই প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করলেন—

> "বলুন, হে কাফিররা! আমি ইবাদত করি না তার, যার ইবাদত তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। আমি কখনো তার ইবাদতকারী হব না, যার ইবাদত তোমরা করেছ। আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী হবে না, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।"
>
> — সূরা আল-কাফিরূন, ১০৯:১–৬

এই সূরা স্পষ্ট ঘোষণা করে দিল—তাওহীদের প্রশ্নে কোনো আপস হতে পারে না।

একদিকে কুরাইশরা সম্পদ, নেতৃত্ব ও সম্মানের লোভ দেখাচ্ছিল, অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নানা ভয়ও দেখাচ্ছিল।

তখন তাঁর চাচা আবু তালিব কুরাইশদের চাপের কথা তাঁকে জানালেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

> "চাচাজান! আল্লাহর শপথ, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবুও আমি এই দাওয়াত ছেড়ে দেব না—যতক্ষণ না আল্লাহ একে বিজয়ী করেন অথবা আমি এ পথে প্রাণ বিসর্জন দিই।"
>
> — সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

এই কথাগুলো শুনে আবু তালিব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন।

তিনি বললেন,

"ভাতিজা! তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহর শপথ, আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমাকে কখনো তাদের হাতে ছেড়ে দেব না।"

যদিও আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও গোত্রীয় দায়িত্ববোধ থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দীর্ঘদিন সুরক্ষা দিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। নিশ্চয়ই বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট।"
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৪–৯৫

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

> "আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে।"
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো মানুষের মন জয় করার জন্য দ্বীনের কোনো বিধান পরিবর্তন করেননি। তিনি জানতেন, মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর আদেশে পরিবর্তন আনা যায় না।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, ইসলামে সৌজন্য, ন্যায়বিচার ও সদাচরণের স্থান রয়েছে; কিন্তু আকীদা ও তাওহীদের প্রশ্নে কোনো আপস নেই।

আজও একজন মুসলিমের উচিত মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস ও বিধানের ক্ষেত্রে অবিচল থাকা।

সূরা আল-কাফিরূন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে কখনো কখনো একাকী দাঁড়াতেও প্রস্তুত থাকতে হয়। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টিই একজন মুমিনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট: শি'বে আবি তালিবে তিন বছরের কঠিন অবরোধ এবং ঈমানের অবিচল পরীক্ষা।

পর্ব

১২

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট

শি'বে আবি তালিবে তিন বছরের কঠিন অবরোধ এবং ঈমানের অবিচল পরীক্ষা

মক্কার কুরাইশ নেতারা একের পর এক চেষ্টা করেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো। নির্যাতন, উপহাস, প্রলোভন, এমনকি আপসের প্রস্তাব—কোনোটিই সফল হলো না। তখন তারা আরও কঠোর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সমর্থকদের এমনভাবে একঘরে করে দেওয়া, যেন তারা ক্ষুধা ও কষ্টে বাধ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে।

কুরাইশের নেতারা একত্র হয়ে একটি লিখিত চুক্তি তৈরি করল। তারা শপথ করল—

বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব গোত্রের সঙ্গে কোনো কেনাবেচা করা হবে না।

তাদের সঙ্গে কোনো বিবাহবন্ধন করা হবে না।

তাদের সঙ্গে কোনো সামাজিক সম্পর্ক রাখা হবে না।

মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাদের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ চলতেই থাকবে।

চুক্তিপত্রটি লিখে কাবাঘরের ভেতরে ঝুলিয়ে রাখা হলো। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩১৮৫; নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ)

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবের অধিকাংশ সদস্য মক্কার উপকণ্ঠে শি'বে আবি তালিব নামক উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

এই অবরোধ প্রায় তিন বছর স্থায়ী হয়।

এ ছিল অত্যন্ত কঠিন সময়।

বাইরে থেকে কেউ তাদের কাছে খাদ্য বিক্রি করত না। বাজারে কোনো মুসলিম কিছু কিনতে গেলে কুরাইশ নেতারা দাম এত বাড়িয়ে দিত যে তারা কিনতে পারতেন না।

অনেক দিন এমন কেটেছে, যখন শিশুদের কান্নার শব্দ দূর থেকে শোনা যেত। ক্ষুধার তীব্রতায় তারা গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিলেন। নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে এই কষ্টের বিবরণ এসেছে।

তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করেননি। তিনি সাহাবিদের ধৈর্যের শিক্ষা দিতেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা রাখতে বলতেন।

আল্লাহ বলেন,

> "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের ওপর এখনো তাদের মতো পরীক্ষা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে? তাদের ওপর বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট এসেছে এবং তারা এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছে যে, রাসূল ও তাঁর সঙ্গে থাকা মুমিনরা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২১৪

কুরাইশের সবাই কিন্তু এই অবিচারে সন্তুষ্ট ছিল না। কিছু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মনে করলেন, আত্মীয়দের সঙ্গে এমন আচরণ আর চলতে পারে না।

তাদের মধ্যে ছিলেন হিশাম ইবন আমর, যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া, মুতইম ইবন আদি, আবুল বুখতারি এবং যামআ ইবন আল-আসওয়াদ। তারা গোপনে পরামর্শ করে এই অন্যায় চুক্তি বাতিল করার উদ্যোগ নিলেন। নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে তাঁদের এই ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে।

এদিকে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন যে, কাবাঘরে ঝুলিয়ে রাখা চুক্তিপত্রটি উইপোকা (দীমক) খেয়ে ফেলেছে। সেখানে শুধু আল্লাহর নামের অংশটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ তাঁর চাচা আবু তালিবকে জানালেন। আবু তালিব কুরাইশ নেতাদের সামনে গিয়ে বললেন,

"যদি মুহাম্মাদ যা বলেছেন তা সত্য হয়, তাহলে তোমরা এই অবরোধ তুলে নেবে। আর যদি তিনি মিথ্যা বলে থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।"

কুরাইশরা এতে সম্মত হলো।

তারা কাবাঘরের ভেতর থেকে চুক্তিপত্র বের করে দেখল—ঠিক তাই হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় উইপোকা পুরো দলিল খেয়ে ফেলেছে; কেবল "বিসমিকা আল্লাহুম্মা" (আল্লাহর নাম) অংশটি অক্ষত রয়েছে। (সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

এরপর অবরোধ ভেঙে যায় এবং মুসলিমরা শি'ব থেকে বেরিয়ে আসেন।

তিন বছরের সেই কঠিন পরীক্ষা মুসলিমদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। তারা বুঝে গিয়েছিলেন, দুনিয়ার কষ্ট সাময়িক; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী।

আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি।"
>
> — সূরা আশ-শারহ, ৯৪:৫–৬

শি'বে আবি তালিবের এই ঘটনা আমাদের শেখায়, সত্যের পথে চলতে গেলে কখনো কখনো দীর্ঘ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তাঁর জন্য এমন পথ খুলে দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

এ ঘটনাটি আরও শেখায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়পরায়ণ মানুষের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মূল্যবান। কুরাইশের মধ্যেও এমন মানুষ ছিলেন, যারা সত্যকে গ্রহণ না করলেও অন্যায়কে সমর্থন করেননি।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
শোকের বছর: খাদিজা (রা.) ও আবু তালিবের ইন্তিকাল, তায়েফ সফর এবং অবিচল ধৈর্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

পর্ব

১৩

শোকের বছর

খাদিজা (রা.) ও আবু তালিবের ইন্তিকাল, তায়েফ সফর এবং অবিচল ধৈর্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

শি'বে আবি তালিবের কঠিন অবরোধ শেষ হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক সময় তখনও সামনে অপেক্ষা করছিল।

অবরোধ শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পরপর হারালেন তাঁর জীবনের দুই মহান অবলম্বনকে।

প্রথমে ইন্তিকাল করলেন তাঁর প্রিয় চাচা আবু তালিব। তিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ভাতিজাকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর জীবিত থাকাকালীন কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে সাহস পেত না।

আবু তালিবের মৃত্যুর কিছুদিন পরই ইন্তিকাল করলেন উম্মুল মুমিনীন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.)।

প্রায় পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, সাহস এবং সহযোগী। তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন, কঠিন সময়ে নিজের সম্পদ ব্যয় করেছিলেন এবং প্রতিটি বিপদে তাঁর পাশে অটল ছিলেন।

এই দুই প্রিয়জনকে হারিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীরভাবে শোকাহত হন। ইতিহাসে এই বছরটি "আমুল হুযন" (শোকের বছর) নামে পরিচিত।

কুরাইশদের নির্যাতনও আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেল। কারণ এখন আর আবু তালিবের গোত্রীয় সুরক্ষা ছিল না।

এমন কঠিন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন কোনো জনপদে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মক্কা থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরের তায়েফ নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুক্তদাস যায়েদ ইবন হারিসা (রা.)।

তায়েফে তিনি সাকীফ গোত্রের নেতাদের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বান গ্রহণ তো করলই না, বরং অত্যন্ত অবমাননাকর ভাষায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল।

তারা শহরের উচ্ছৃঙ্খল লোকজন ও শিশুদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। পাথরের আঘাতে তাঁর পবিত্র পা রক্তাক্ত হয়ে গেল। যায়েদ (রা.) নিজের শরীর দিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেও আহত হলেন।

অবশেষে তিনি শহরের বাইরে একটি আঙুর বাগানে আশ্রয় নিলেন।

সেখানে তিনি আল্লাহর দরবারে এক হৃদয়স্পর্শী দোয়া করলেন—

> "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার অক্ষমতার অভিযোগ করছি। হে পরম দয়ালু! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক, আপনিই আমার প্রতিপালক..."
>
> — সীরাত ইবন হিশাম; আল-মু'জামুল কাবীর

এই দোয়ায় কোথাও মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আবেদন ছিল না; ছিল শুধু আল্লাহর রহমতের আবেদন।

এরপর আল্লাহ জিবরীল (আ.)-কে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাহাড়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা।

ফেরেশতা বললেন,

> "আপনি চাইলে আমি এই দুই পাহাড় একত্র করে তাদের ওপর চাপা দিয়ে দিই।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২৩১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯৫

কিন্তু দয়ার নবী ﷺ প্রতিশোধের পথ বেছে নিলেন না।

তিনি বললেন,

> "না। বরং আমি আশা করি, আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২৩১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯৫

কী অসাধারণ দয়া!

যারা তাঁকে রক্তাক্ত করেছিল, তাঁদের জন্যও তিনি হিদায়াতের আশা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সত্যিই তায়েফের বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।

তায়েফ থেকে ফেরার পথে নাখলা উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন একদল জিন সেই তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয় এবং ঈমান গ্রহণ করে।

আল্লাহ বলেন,

> "বলুন, আমার প্রতি ওহি করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনেছে। তারপর তারা বলেছে, 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। এটি সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।'"
>
> — সূরা আল-জিন, ৭২:১–২

আবার আল্লাহ বলেন,

> "আমি যখন আপনার দিকে কয়েকজন জিনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল..."
>
> — সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:২৯–৩২

মানুষের অনেকেই যখন তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল, তখন আল্লাহ জিনদের একটি দলকে কুরআন শোনালেন এবং তারা ঈমান গ্রহণ করল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছিল এক বড় সান্ত্বনা।

তায়েফের এই ঘটনা আমাদের শেখায়, একজন মুমিনের প্রকৃত শক্তি প্রতিশোধে নয়; ধৈর্য, ক্ষমা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন আরও শেখায়, দাওয়াতের পথে প্রত্যাখ্যান মানেই ব্যর্থতা নয়। আমাদের কাজ সত্য পৌঁছে দেওয়া; মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

ইসরা ও মি'রাজ: মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা, সপ্ত আসমান ভ্রমণ এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা।

পর্ব

১৪

ইসরা ও মি'রাজ

মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা, সপ্ত আসমান ভ্রমণ এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা

শোকের বছর, তায়েফের নির্মম অভিজ্ঞতা এবং একের পর এক কঠিন পরীক্ষার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে এমন এক সম্মান দান করলেন, যা মানব ইতিহাসে একক ও অতুলনীয়।

এটি ছিল ইসরা ও মি'রাজ—এক অলৌকিক সফর, যা আল্লাহর অসীম কুদরতের অন্যতম নিদর্শন।

আল্লাহ বলেন,

> "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"
>
> — সূরা আল-ইসরা, ১৭:১

এক রাতে জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি বুরাক নামক এক বিশেষ বাহনে আরোহণ করে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদুল আকসায় পৌঁছেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬২)

মসজিদুল আকসায় আল্লাহ সকল নবীকে একত্রিত করেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন।

এটি ছিল একটি মহান ঘোষণা—পূর্ববর্তী সব নবীর দাওয়াতের ধারাবাহিকতা মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল।"

এরপর শুরু হয় মি'রাজ—আসমানের দিকে তাঁর মহান সফর।

জিবরীল (আ.) তাঁকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছালে দরজা খুলে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি নবী আদম (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দ্বিতীয় আসমানে তিনি সাক্ষাৎ করেন ঈসা (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর সঙ্গে।

তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আ.)।

চতুর্থ আসমানে ইদরিস (আ.)।

পঞ্চম আসমানে হারূন (আ.)।

ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ.)।

আর সপ্তম আসমানে তিনি সাক্ষাৎ করেন ইবরাহিম (আ.)-এর সঙ্গে। তিনি তখন বায়তুল মা'মুর-এর পাশে হেলান দিয়ে ছিলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৪)

এরপর রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-কে নিয়ে যাওয়া হয় সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত—যেখানে সৃষ্টিজগতের সীমা শেষ হয়। তিনি সেখানে আল্লাহর বহু মহান নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন।

আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনগুলোর কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন।"
>
> — সূরা আন-নাজম, ৫৩:১৮

এই মহান সফরেই আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন।

ফিরে আসার পথে মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন,

"আপনার উম্মতের ওপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"পঞ্চাশ ওয়াক্ত।"

মূসা (আ.) বললেন,

"আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে হালকা করার আবেদন করুন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন। প্রতিবারই আল্লাহ সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত তা পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হলো।

তখনও মূসা (আ.) আরও কমানোর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> "এখন আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৪৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬২

তখন আল্লাহ ঘোষণা করলেন,

> "এগুলো পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু সওয়াব হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় না।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৪৯

এ কারণেই সালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। অন্য সব বিধান পৃথিবীতে ওহির মাধ্যমে নাযিল হয়েছে, কিন্তু সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছে আসমানে, এই মহিমান্বিত সফরের মাধ্যমে।

পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরাইশদের কাছে এই ঘটনার কথা বললেন, তারা তাঁকে উপহাস করতে লাগল।

তারা বলল,

"এক রাতেই মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে আবার ফিরে এসেছ?"

তারা এটিকে অসম্ভব মনে করল।

কিন্তু আবু বকর (রা.) যখন এ সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন,

> "তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্য বলেছেন। আমি তো এর চেয়েও বড় বিষয়ে তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করি—আসমান থেকে তাঁর কাছে যে সংবাদ সকাল-সন্ধ্যায় আসে, তাও আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।"
>
> — মুসনাদ আহমাদ; আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম

এই ঘটনার পর থেকেই তিনি "আস-সিদ্দীক" উপাধিতে আরও সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

ইসরা ও মি'রাজ আমাদের শেখায়, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার পর আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য এমন সম্মান ও স্বস্তির দরজা খুলে দেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

এ ঘটনা আরও শেখায়, সালাত শুধু একটি ইবাদত নয়; এটি আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যম। তাই একজন মুমিনের জীবনে সালাতের মর্যাদা সর্বোচ্চ হওয়া উচিত।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
ইয়াসরিবের নতুন আশা: আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইআত এবং হিজরতের প্রস্তুতির সূচনা।

পর্ব

১৫

ইয়াসরিবের নতুন আশা

আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইআত এবং হিজরতের প্রস্তুতির সূচনা

ইসরা ও মি'রাজের পরও মক্কার মানুষের বিরোধিতা থামেনি। বরং কুরাইশ নেতারা ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য আরও কঠোর হয়ে উঠল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন এক জনপদে ইসলামের বীজ বপন করছিলেন, যেখানে খুব শিগগিরই একটি নতুন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেই জনপদের নাম ছিল ইয়াসরিব—যা পরে মাদীনাতুন নবী (মদিনা) নামে পরিচিত হয়।

ইয়াসরিবে প্রধানত আওস ও খাযরাজ—এই দুই আরব গোত্র বাস করত। বহু বছর ধরে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসছিল। অন্যদিকে সেখানে কয়েকটি ইহুদি গোত্রও ছিল। তারা প্রায়ই বলত,

> "শেষ যুগের একজন নবী আসবেন। আমরা তাঁর অনুসরণ করে তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হব।"

এ কথা ইয়াসরিবের অনেক আরবের কানে পৌঁছেছিল।

হজের মৌসুমে এক বছর খাযরাজ গোত্রের ছয়জন ব্যক্তি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তিনি তাঁদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করলেন।

তাঁরা একে অপরকে বলতে লাগলেন,

> "আল্লাহর শপথ! এ-ই সেই নবী, যার কথা ইহুদিরা আমাদের বলে আসছে। তারা যেন আমাদের আগে তাঁর অনুসারী হয়ে না যায়।"

তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে শুরু করলেন। (সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

পরের বছর হজের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে বারোজন মুসলিম মক্কায় এলেন।

তাঁরা মক্কার অদূরে আকাবা নামক স্থানে গোপনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এটি প্রথম আকাবার বাইআত নামে পরিচিত।

তাঁরা অঙ্গীকার করলেন—

আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবেন না।

চুরি করবেন না।

ব্যভিচার করবেন না।

সন্তান হত্যা করবেন না।

মিথ্যা অপবাদ দেবেন না।

সৎকাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্য হবেন না।

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৮৯২)

আলেমগণ এই বাইআতকে "বাইআতুন নিসা" বলেও উল্লেখ করেছেন, কারণ এতে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার ছিল না। পরবর্তীতে সূরা আল-মুমতাহিনাহ (৬০:১২)-এ নারীদের বাইআতের যে শর্তগুলো উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সঙ্গে মুসআব ইবন উমাইর (রা.)-কে ইয়াসরিবে পাঠালেন।

মুসআব (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম শিক্ষক ও দাঈদের অন্যতম।

তিনি মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে কুরআন শিক্ষা দিতে লাগলেন।

তাঁর দাওয়াতে আওস ও খাযরাজের বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সা'দ ইবন মু'আয (রা.) এবং উসাইদ ইবন হুদাইর (রা.)।

অল্প সময়ের মধ্যেই ইয়াসরিবের প্রায় প্রতিটি পরিবারে ইসলামের আলো পৌঁছে যায়।

পরের বছর, অর্থাৎ নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে, হজের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে তিয়াত্তরজন পুরুষ এবং দুইজন নারী গোপনে মক্কায় আসেন।

রাতের অন্ধকারে আকাবায় তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ইয়াসরিববাসীদের বললেন,

"মুহাম্মাদ আমাদের মাঝে সম্মানিত ও নিরাপদে আছেন। যদি তোমরা তাঁকে নিয়ে যাও, তবে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হবে।"

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করলেন।

তাঁরা সবাই প্রতিশ্রুতি দিলেন—

> "আমরা আপনাকে আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মতোই রক্ষা করব।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> "তোমরা যদি এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করো, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"

তাঁরা আনন্দের সঙ্গে বাইআত করলেন। (মুসনাদ আহমাদ ; সীরাত ইবন হিশাম)

এই ঘটনাই ইতিহাসে দ্বিতীয় আকাবার বাইআত নামে পরিচিত।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াসরিবের বারোজন প্রতিনিধিকে তাঁদের নিজ নিজ এলাকার দায়িত্বশীল হিসেবে মনোনীত করলেন, যাতে তারা ইসলামের শিক্ষা মানুষের কাছে

পৌঁছে দিতে পারেন।

দ্বিতীয় আকাবার বাইআতের পর ইসলাম একটি নতুন যুগে প্রবেশ করল।

মক্কায় মুসলিমরা ছিলেন নির্যাতিত সংখ্যালঘু। কিন্তু ইয়াসরিবে তাদের জন্য একটি নিরাপদ সমাজ গড়ে উঠছিল।

আল্লাহ তাআলা ধীরে ধীরে হিজরতের পথ প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "অনুবাদ: আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
>
> — সূরা আন-নিসা, ৪:১০০

আকাবার এই দুই বাইআত আমাদের শেখায়, ইসলামের বিজয় হঠাৎ আসেনি; এটি ঈমান, ত্যাগ, দাওয়াত এবং ধৈর্যের ধারাবাহিক ফল।

এটি আরও শেখায়, আল্লাহ যখন কোনো দ্বীনি কাজের ফয়সালা করেন, তখন তিনি এমন মানুষ ও এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন, যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
হিজরতের সূচনা: কুরাইশদের হত্যার ষড়যন্ত্র, সওর গুহায় আশ্রয় এবং আল্লাহর অলৌকিক সাহায্য।

পর্ব

১৬

হিজরতের সূচনা

কুরাইশদের হত্যার ষড়যন্ত্র, সওর গুহায় আশ্রয় এবং আল্লাহর অলৌকিক সাহায্য

দ্বিতীয় আকাবার বাইআতের পর মদিনার দরজা মুসলিমদের জন্য খুলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের একে একে মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিবে হিজরত করার অনুমতি দিলেন।

মুসলিমরা গোপনে নিজেদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও জন্মভূমি ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মদিনার পথে রওনা হতে লাগলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর (রা.), আলী (রা.) এবং কয়েকজন মুসলিম ছাড়া প্রায় সবাই হিজরত করে ফেললেন।

এদিকে কুরাইশ নেতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল, মদিনায় মুসলিমরা একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলছে। যদি মুহাম্মাদ ﷺ-ও সেখানে পৌঁছে যান, তবে ইসলামকে আর থামানো সম্ভব হবে না।

তারা দারুন নাদওয়ায় এক জরুরি সভা করল।

বিভিন্ন মতামতের পর আবু জাহল একটি পরিকল্পনা দিল। সে বলল,

"প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী যুবক নির্বাচিত করা হোক। তারা সবাই একসঙ্গে মুহাম্মাদকে হত্যা করবে। তাহলে তাঁর রক্তের দায় একক কোনো গোত্রের ওপর পড়বে না, আর বানু হাশিমও সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।"

এই ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "আর স্মরণ করুন, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল—আপনাকে বন্দি করবে, হত্যা করবে অথবা দেশ থেকে বের করে দেবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিল, আর আল্লাহও পরিকল্পনা করছিলেন। আর আল্লাহই সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।"

> — সূরা আল-আনফাল, ৮:৩০

আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই রাতেই হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন।

তিনি আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-কে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন এবং মানুষের গচ্ছিত আমানতগুলো যথাযথ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন।

এটি ছিল তাঁর মহান চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তারাই নিজেদের মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছেই আমানত হিসেবে রাখত। আর তিনি সেই আমানত যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে গেলেন।

রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আল্লাহ তাঁর শত্রুদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিলেন। তারা ঘর ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু তাঁকে বের হতে দেখতে পেল না। (সীরাত ইবন হিশাম; তাফসির ইবন কাসির, সূরা ইয়াসীনের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহের আলোচনায়)

এরপর তিনি আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.)-এর সঙ্গে মদিনার পথে রওনা হলেন। তবে সরাসরি উত্তর দিকে না গিয়ে প্রথমে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সওর গুহায় আশ্রয় নিলেন, যাতে কুরাইশদের অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়।

তিন দিন তাঁরা সেই গুহায় অবস্থান করলেন।

আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ দিনে মক্কায় থেকে কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং রাতে গুহায় এসে সব খবর জানাতেন।

তাঁর দাস আমির ইবন ফুহাইরা (রা.) ছাগলের পাল নিয়ে সেই পথে চলতেন, যাতে পদচিহ্ন মুছে যায়।

আর আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) গোপনে তাঁদের জন্য খাবার পৌঁছে দিতেন। কোমরের বেল্ট ছিঁড়ে খাবারের পাত্র বেঁধেছিলেন বলে তিনি "জাতুন নিটাকাইন" (দুই বেল্টের অধিকারিণী) উপাধি লাভ করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯০৫)

এদিকে কুরাইশের অনুসন্ধানকারী দল সওর গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

আবু বকর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,

> "হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিচল বিশ্বাসে বললেন,

> "হে আবু বকর! সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ?"

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন,

> "চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬৫৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৩৮১

এই ঘটনার কথাই আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন—

> "যখন তারা দুজন গুহায় ছিলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।' তখন আল্লাহ তাঁর ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁকে সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি।"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০

তিন দিন পর পরিস্থিতি শান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর (রা.) এবং তাঁদের পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবন উরাইকিত উপকূলীয় পথ ধরে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

এই হিজরত শুধু একটি শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর ছিল না; এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা। এখান থেকেই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়।

হিজরতের এই ঘটনা আমাদের শেখায়, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল মানে হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বোচ্চ পরিকল্পনা, সতর্কতা ও উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তারপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছিলেন আল্লাহর ওপর।

এটি আরও শেখায়, যখন একজন মুমিন আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, তখন আল্লাহ এমনভাবে তাঁর সাহায্য করেন, যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

মদিনায় আগমন: কুবা মসজিদ নির্মাণ, ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা।



তৃতীয় পর্যায়

মাদানী জীবন

মদিনায় আগমন থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত

পর্ব ১৭ – ৩৫

পর্ব

১৭

মদিনায় আগমন

কুবা মসজিদ নির্মাণ, ঐতিহাসিক অভ্যর্থনা এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা

সওর গুহায় তিন দিন অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা.) নিরাপদে মদিনার পথে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য এই সফরে তাঁরা মরুভূমির উত্তাপ, শত্রুর অনুসরণ এবং নানা বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তাঁদের হেফাজত করেছেন।

এদিকে মদিনার মুসলিমরা প্রতিদিন শহরের বাইরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা করতেন। দুপুরের প্রচণ্ড রোদ না ওঠা পর্যন্ত তাঁরা পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তারপর ফিরে যেতেন।

একদিন, যখন সবাই ফিরে গিয়েছিলেন, তখন এক ইহুদি ব্যক্তি দূর থেকে আগত কাফেলাকে দেখে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন,

> "হে আরব সম্প্রদায়! যাঁর জন্য তোমরা প্রতিদিন অপেক্ষা করছ, তিনি এসে গেছেন!"

এ খবর শুনে মুসলিমরা আনন্দে ছুটে এলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯০৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে মদিনা নগরীতে প্রবেশ না করে উপকণ্ঠের কুবা নামক স্থানে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করেন।

এই সময় তিনি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ—মসজিদে কুবা—নির্মাণ করেন।

আল্লাহ তাআলা এ মসজিদের প্রশংসা করে বলেন,

> "যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে দাঁড়ানোই আপনার জন্য অধিক উপযুক্ত। সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

> — সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে এই মসজিদের ফজিলত সম্পর্কে বলেন,

> "যে ব্যক্তি নিজ ঘরে সুন্দরভাবে অজু করে কুবা মসজিদে এসে সালাত আদায় করবে, সে একটি উমরার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।"
>
> — সুনান আত-তিরমিযী, হাদিস: ৩২৪ ; সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস: ১৪১২ — সহিহ

কুবায় অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবার মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে বানু সালিম ইবন আওফ গোত্রের এলাকায় তিনি প্রথম জুমার সালাত আদায় করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল তাঁর নেতৃত্বে মদিনায় প্রথম জুমার সালাত। নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

এরপর তিনি মদিনায় প্রবেশ করলেন।

পুরো শহর আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। নারী, পুরুষ ও শিশুরা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রিয় নবীকে স্বাগত জানাতে লাগলেন। প্রত্যেক আনসার চাইছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন তাঁর বাড়িতে অবস্থান করেন।

তাঁরা বলতে লাগলেন,

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের বাড়িতে থাকুন।"

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> "তোমরা আমার উটনীটিকে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশেই চলবে।"
>
> — সীরাত ইবন হিশাম ; মুসনাদ আহমাদে অর্থগত সমর্থন রয়েছে

উটনীটি চলতে চলতে একটি খালি জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। এই স্থানটি ছিল দুই এতিম বালকের মালিকানাধীন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই জমিটি মূল্য দিয়ে কিনে নিলেন। তিনি বিনা মূল্যে তা গ্রহণ করেননি।

সেখানেই পরে নির্মিত হয় ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদতকেন্দ্র—মসজিদে নববী।

মসজিদ নির্মাণের কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও সাহাবিদের সঙ্গে ইট ও পাথর বহন করতেন। সাহাবিরা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেও তিনি তাঁদের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করতেন।

তাঁরা কাজ করতে করতে কবিতা আবৃত্তি করতেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁদের সঙ্গে উৎসাহ দিতেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৮৩৪ ; সহিহ মুসলিম)

মসজিদের পাশেই তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য সাধারণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়। সেখান থেকেই তিনি ইসলামী সমাজ পরিচালনা করতেন।

মদিনায় আগমনের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

এখন মুসলিমরা আর নির্যাতিত সংখ্যালঘু নয়; বরং তারা এমন একটি সমাজ গঠন করতে শুরু করল, যার ভিত্তি ছিল ঈমান, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব এবং আল্লাহর আনুগত্য।

আল্লাহ বলেন,

> "আর তিনি তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আপনি যদি পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।"
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:৬৩

মদিনায় আগমনের এই ঘটনা আমাদের শেখায়, আল্লাহর জন্য ত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জন্মভূমি ছেড়েছিলেন, আল্লাহ তাঁদের এমন এক সমাজ দান করেছিলেন, যা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত হয়।

এটি আরও শেখায়, ইসলামে নেতৃত্ব মানে শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়; বরং মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা। মসজিদে নববী নির্মাণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অংশগ্রহণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

মুহাজির ও আনসারের ভ্রাতৃত্ব, মদিনা সনদ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন।

পর্ব

১৮

মুহাজির ও আনসারের ভ্রাতৃত্ব, মদিনা সনদ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন

মদিনায় পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে একটি বড় দায়িত্ব ছিল। মক্কা থেকে আগত মুহাজিররা নিজেদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু ছেড়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে মদিনার আনসাররা আন্তরিকভাবে তাঁদের স্বাগত জানালেও, একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সমাজ গড়ে তোলা ছিল সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, শুধু একই শহরে বসবাস করলেই একটি আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে না। মানুষের অন্তরে পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও ঈমানি ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে হয়।

তাই তিনি এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব (মুয়াখাত) প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রত্যেক মুহাজিরকে একজন আনসারের সঙ্গে ভাই হিসেবে যুক্ত করে দিলেন।

এটি শুধু আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল না; বরং একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, সহযোগিতা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন গড়ার অঙ্গীকার ছিল।

আনসারদের এই ভালোবাসা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর।

আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করে বলেন,

> "তারা (আনসাররা) নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুহাজিরদের নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর যারা নিজেদের মনের কৃপণতা থেকে রক্ষা পায়, তারাই সফল।"

> — সূরা আল-হাশর, ৫৯:৯

এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন সা'দ ইবন রাবি' (রা.)। তিনি তাঁর মুহাজির ভাই আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.)-কে বললেন,

> "আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী। আমার সম্পদের অর্ধেক আপনি নিয়ে নিন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২০৪৮

কিন্তু আবদুর রহমান (রা.) বিনয়ের সঙ্গে বললেন,

> "আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দান করুন। আপনি শুধু আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২০৪৮

তিনি নিজের পরিশ্রমে ব্যবসা শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেন।

এ ঘটনা আমাদের শেখায়, একজন মুসলিম অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সামর্থ্য থাকলে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করাই উত্তম।

এদিকে মদিনায় শুধু মুসলিমরাই বাস করতেন না। সেখানে বিভিন্ন ইহুদি গোত্র এবং আরও কিছু আরব গোত্রও ছিল।

সব সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়ন করলেন, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত।

এই সনদে উল্লেখ ছিল—

প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে।

সবাই মিলে মদিনার নিরাপত্তা রক্ষা করবে।

কোনো নির্যাতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা হবে।

অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার কোনো স্থান থাকবে না।

কোনো শত্রু মদিনায় আক্রমণ করলে সবাই একসঙ্গে শহর রক্ষা করবে।

(সীরাত ইবন হিশাম; ইবন কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন, যার ভিত্তি ছিল ন্যায়বিচার, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা।

আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন; আর অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০

মসজিদে নববী ছিল এই নতুন সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এখানেই সালাত আদায় হতো, কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো, বিচারকার্য পরিচালিত হতো, প্রতিনিধি দলগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো।

এভাবেই মদিনায় একটি আদর্শ ইসলামী সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হলো—যেখানে ঈমান, ইবাদত, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবিকতা একসূত্রে গাঁথা ছিল।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, ইসলামের শক্তি শুধু সংখ্যায় নয়; বরং আন্তরিক ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সহযোগিতায়।

আবার এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, একজন প্রকৃত মুসলিম নিজের জন্য যেমন কল্যাণ কামনা করে, তেমনি তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও একই কল্যাণ কামনা করে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
কিবলা পরিবর্তন, রমজানের রোজা ফরজ এবং বদরের যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি—মদিনায় ইসলামী সমাজের নতুন অধ্যায়।

পর্ব

১৯

কিবলা পরিবর্তন, রমজানের রোজা ফরজ এবং বদরের যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি

মদিনায় ইসলামী সমাজ ধীরে ধীরে সুসংগঠিত হয়ে উঠছিল। মসজিদে নববী ছিল ইবাদত, শিক্ষা ও রাষ্ট্রপরিচালনার কেন্দ্র। মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মদিনা সনদের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছে।

এ সময় আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান দান করলেন, যা ইসলামী সমাজকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

এর মধ্যে অন্যতম ছিল কিবলা পরিবর্তন।

মদিনায় হিজরতের পর প্রায় ষোল বা সতেরো মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা বায়তুল মুকাদ্দাস (মসজিদুল আকসা)-এর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, যেন কিবলা ইবরাহিম (আ.)-এর নির্মিত কাবাঘরের দিকে নির্ধারিত হয়।

তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করলেন—

> "আমি তো আপনার মুখমণ্ডল বারবার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। তাই আমি অবশ্যই আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি আপনার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন। আর তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের মুখ সেদিকেই ফিরিয়ে নেবে।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাতরত অবস্থায়ই কাবার দিকে ফিরে গেলেন, সাহাবিরাও তাঁর অনুসরণ করলেন।

যে মসজিদে এ ঘটনা ঘটেছিল, সেটি পরে মাসজিদুল কিবলাতাইন (দুই কিবলার মসজিদ) নামে পরিচিত হয়। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪৮৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৫২৫)

এই পরিবর্তন শুধু দিক পরিবর্তন ছিল না; এটি ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বতন্ত্র পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

এর কিছুদিন পর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর রমজানের রোজা ফরজ করলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৩

আল্লাহ আরও বলেন,

> "রমজান মাস—এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।"
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৫

রমজানের রোজা শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করার নাম নয়; এটি আত্মসংযম, তাকওয়া, ধৈর্য এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রশিক্ষণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৭৬০

এদিকে কুরাইশরা মক্কায় বসেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা মদিনায় ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে মেনে নিতে পারছিল না।

মুহাজিরদের সম্পদ তারা অন্যায়ভাবে দখল করে নিয়েছিল। মুসলিমদের ওপর আক্রমণের হুমকিও অব্যাহত ছিল।

এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের আত্মরক্ষার অনুমতি দিলেন।

তিনি বলেন,

> "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে; কারণ তাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।"
>
> — সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৯

এটি ছিল ইসলামে যুদ্ধের প্রথম অনুমতি। উদ্দেশ্য ছিল না আগ্রাসন; বরং নির্যাতনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি ছোট অভিযানে সাহাবিদের পাঠালেন। এসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। তখনও কোনো বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

এদিকে খবর এল, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি বিশাল বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নিয়ে সেই কাফেলার গতিপথে রওনা হলেন। কিন্তু কুরাইশরা বিষয়টি জানতে পেরে মক্কা থেকে প্রায় এক হাজার সৈন্যের একটি বড় বাহিনী পাঠিয়ে দিল।

এভাবেই ইতিহাসের প্রথম মহান যুদ্ধ—বদরের যুদ্ধ—এর সূচনা হতে চলল।

মুসলিমরা তখনও জানতেন না যে, তাঁদের সামনে ইসলামের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় অপেক্ষা করছে।

এই ঘটনাগুলো আমাদের শেখায়, ইসলামের বিধান ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে, যাতে মানুষ তা সহজে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

কিবলা পরিবর্তন আমাদের শেখায়, একজন মুমিনের প্রকৃত পরিচয় আল্লাহর নির্দেশের নিঃশর্ত আনুগত্যে। আর রমজানের রোজা শেখায়, তাকওয়াই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় শক্তি।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
বদরের যুদ্ধ: ইসলামের প্রথম মহান বিজয়, ফেরেশতাদের সাহায্য এবং সত্য-মিথ্যার ঐতিহাসিক মুখোমুখি সংঘর্ষ।

পর্ব

২০

বদরের যুদ্ধ

ইসলামের প্রথম মহান বিজয়, ফেরেশতাদের সাহায্য এবং সত্য-মিথ্যার ঐতিহাসিক মুখোমুখি সংঘর্ষ

হিজরতের দ্বিতীয় বছর, রমজান মাস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার গতিপথে রওনা হয়েছিলেন। কারণ মক্কাবাসীরা মুসলিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করেছিল এবং সেই সম্পদ দিয়েই তাদের বাণিজ্য চলছিল।

কিন্তু আবু সুফিয়ান কৌশলে কাফেলাকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন। একই সময়ে মক্কা থেকে প্রায় এক হাজার সশস্ত্র সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী বদরের দিকে অগ্রসর হয়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন মাত্র তিন শত তেরোজন সাহাবি। তাঁদের কাছে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া এবং প্রায় সত্তরটি উট। অনেক সাহাবি পালাক্রমে একই উটে আরোহণ করছিলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৯)

মানবীয় দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ ছিল অসম।

তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

মুহাজির ও আনসার—উভয় পক্ষই একবাক্যে বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেন, তবুও আমরা আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।"

বিশেষ করে সা'দ ইবন মু'আয (রা.) আনসারদের পক্ষ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৯; সীরাত ইবন হিশাম)

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের কূপগুলোর নিকটে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সাহাবি হুবাব ইবন মুনযির (রা.) যুদ্ধকৌশলগত একটি পরামর্শ দিলেন—শত্রুপক্ষের কাছের কূপগুলো বন্ধ করে দিয়ে মুসলিমরা যেন পানির উৎস নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। (সীরাত ইবন হিশাম)

যুদ্ধের আগের রাতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "স্মরণ করুন, যখন তিনি তোমাদের ওপর তন্দ্রা নাযিল করেছিলেন, যা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি; আর তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন, যাতে এর মাধ্যমে তোমাদের পবিত্র করেন..."
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:১১

রাতভর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন,

> "হে আল্লাহ! আপনি যদি আজ এই ছোট দলটিকে ধ্বংস হতে দেন, তবে পৃথিবীতে আর আপনার ইবাদত করা হবে না।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৩

এমনকি দোয়া করতে করতে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। আবু বকর (রা.) তা তুলে দিয়ে বললেন,

> "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতিপালক অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৩

তখন আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করলেন—

> "যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, 'আমি একের পর এক এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করব।'"

> — সূরা আল-আনফাল, ৮:৯

আরও বলেন,

> "বিজয় তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:১০

যুদ্ধ শুরু হলো একক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে।

মুসলিমদের পক্ষ থেকে হামযা (রা.), আলী (রা.) এবং উবাইদা ইবন হারিস (রা.) বেরিয়ে এলেন।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো উতবা ইবন রাবিয়া, শাইবা ইবন রাবিয়া এবং ওয়ালিদ ইবন উতবা।

সংক্ষিপ্ত এই দ্বন্দ্বে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৬৫)

এরপর উভয় বাহিনীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ একমুঠো মাটি নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন,

> "মুখগুলো বিকৃত হোক!"

আল্লাহ বলেন,

> "আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।"
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:১৭

অবশেষে আল্লাহ মুসলিমদের এক ঐতিহাসিক বিজয় দান করলেন।

কুরাইশের সত্তরজন নিহত হলো এবং সত্তরজন বন্দি হলো।

নিহতদের মধ্যে ছিল ইসলামের প্রধান শত্রুরা—আবু জাহল, উমাইয়া ইবন খালাফ, উতবা, শাইবা এবং আরও অনেক নেতা। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৬২–৩৯৬৪)

মুসলিমদের পক্ষ থেকে চৌদ্দজন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা এই দিনটির নাম দিয়েছেন—

> "ইয়াওমুল ফুরকান"—অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের দিন।

আল্লাহ বলেন,

> "যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং সেই দিনের প্রতি ঈমান এনে থাকো, যেদিন আমি আমার বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছিলাম—সেই ফুরকানের দিন, যেদিন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল..."
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:৪১

বদরের বিজয় শুধু একটি যুদ্ধজয় ছিল না; এটি ছিল ঈমান, তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর সাহায্যের এক জীবন্ত প্রমাণ।

মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম, অস্ত্র ছিল সীমিত; কিন্তু তাদের ঈমান ছিল দৃঢ়। আর যখন তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আল্লাহর ওপর ভরসা করল, তখন আল্লাহ এমনভাবে সাহায্য করলেন, যা মানবীয় হিসাবকে অতিক্রম করে গেল।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, বিজয় কখনো শুধু সংখ্যা বা শক্তির ওপর নির্ভর করে না; প্রকৃত বিজয় আসে আল্লাহর আনুগত্য, আন্তরিকতা এবং তাঁর সাহায্যের মাধ্যমে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
বদরের পরিণতি: যুদ্ধবন্দিদের প্রতি দয়া, মুসলিম সমাজের নতুন মর্যাদা এবং ঈমানের পরীক্ষার নতুন অধ্যায়।

পর্ব

২১

বদরের পরিণতি

যুদ্ধবন্দিদের প্রতি দয়া, মুসলিম সমাজের নতুন মর্যাদা এবং ঈমানের পরীক্ষার নতুন অধ্যায়

বদরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের এমন এক বিজয় দান করেছেন, যা কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণই প্রমাণ করল—ইসলামের উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়; বরং ন্যায়বিচার, দয়া এবং মানুষের হিদায়াত।

যুদ্ধক্ষেত্রে কুরাইশের সত্তরজন নিহত হয়েছিল এবং সত্তরজন বন্দি হয়েছিল। এটি ছিল মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ, তাই যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে—এ বিষয়ে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.) বললেন,

> "হে আল্লাহর রাসূল! এরা আমাদের আত্মীয়স্বজন। আমার মত হলো, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক। হয়তো ভবিষ্যতে আল্লাহ তাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দেবেন।"

অন্যদিকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) মত দিলেন,

> "এরা ইসলামের প্রধান শত্রু। তাদের শাস্তি দেওয়াই উচিত।"

(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.)-এর মত গ্রহণ করলেন। যাদের পরিবার মুক্তিপণ দিতে সক্ষম ছিল, তারা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে গেল।

আর যেসব বন্দি শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু অর্থ দিতে পারতেন না, তাঁদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা করা হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন—

যদি কোনো বন্দি মদিনার দশজন মুসলিম শিশুকে পড়া-লেখা শেখায়, তবে সেটিই হবে তার মুক্তিপণ।

(মুসনাদ আহমাদ; সীরাত ইবন হিশামে এর উল্লেখ রয়েছে)

এটি ছিল ইতিহাসের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যুদ্ধবন্দিদের শ্রম বা নির্যাতনের মাধ্যমে নয়, শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মুক্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা এ সময় বন্দিদের সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

> "হে নবী! তোমাদের হাতে যে বন্দিরা আছে, তাদের বলুন, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কল্যাণ দেখেন, তবে তিনি তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তার চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:৭০

বদরের বন্দিদের মধ্যে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব। আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়নি। তাকেও নিয়ম অনুযায়ী মুক্তিপণ দিতে হয়েছিল। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩০০৭)

এতে প্রমাণিত হয়, ইসলামে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই।

বদরের বিজয়ের পর মদিনায় মুসলিমদের মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। আশপাশের গোত্রগুলো বুঝতে পারল, এটি আর একটি দুর্বল দল নয়; বরং আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত একটি শক্তিশালী সমাজ।

কিন্তু এই বিজয়ের পরই মুসলিমদের সামনে নতুন পরীক্ষা শুরু হলো।

কিছু মানুষের অন্তরে ঈমান ছিল না, কিন্তু তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করল। এদেরকেই কুরআনে মুনাফিক বলা হয়েছে।

তাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল। মদিনায় তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পর সেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। ফলে সে অন্তরে

ইসলামকে শত্রু মনে করলেও প্রকাশ্যে মুসলিম পরিচয় ধারণ করে। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৫৬১ ; সহিহ মুসলিম)

এদিকে মদিনার কিছু ইহুদি গোত্রও বদরের বিজয়ের পর মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করতে শুরু করল।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সতর্ক করে বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতের খিয়ানত করো না।"
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:২৭

আরও বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যে অটল থাকো, সদা প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:২০০

বদরের বিজয় মুসলিমদের জন্য যেমন সম্মান নিয়ে এসেছিল, তেমনি দায়িত্বও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অন্যদের নজরে ছিল। তাই আল্লাহ তাঁদের আরও বেশি তাকওয়া, ন্যায়বিচার এবং ঐক্যের শিক্ষা দিলেন।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, ইসলামে বিজয়ের পর অহংকারের স্থান নেই। বরং কৃতজ্ঞতা, ন্যায়বিচার এবং দয়া প্রদর্শনই একজন মুমিনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

যুদ্ধবন্দিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ মানবজাতির জন্য এক অনন্য শিক্ষা—শত্রুকেও মর্যাদা দিতে হয়, অন্যায়ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া নয়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
উহুদের যুদ্ধ: তীরন্দাজদের ভুল, কঠিন পরীক্ষা এবং আল্লাহর আনুগত্যের অবিস্মরণীয় শিক্ষা।

পর্ব

২২

উহুদের যুদ্ধ

তীরন্দাজদের ভুল, কঠিন পরীক্ষা এবং আল্লাহর আনুগত্যের অবিস্মরণীয় শিক্ষা

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান কুরাইশরা কোনোভাবেই ভুলতে পারছিল না। তাদের বহু নেতা নিহত হয়েছিল, বাণিজ্যিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল এবং সমগ্র আরবে তাদের প্রভাব কমে গিয়েছিল। তাই তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুতি নিতে লাগল।

হিজরতের তৃতীয় বছরে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার সৈন্য, দুই শতাধিক অশ্বারোহী এবং বিপুল যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে কুরাইশ বাহিনী মদিনার দিকে অগ্রসর হলো। (সহিহ আল-বুখারি; সীরাত ইবন হিশাম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁর মত ছিল মদিনার ভেতর থেকে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা। কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে না পারা অনেক সাহাবি শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

পরামর্শের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ শহরের বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটি ছিল তাঁর শূরা (পরামর্শ) নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল প্রায় তিন শত লোক নিয়ে মাঝপথ থেকেই ফিরে গেল। ফলে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা এক হাজার থেকে কমে প্রায় সাতশত জনে দাঁড়াল। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৭; সহিহ আল-বুখারি)

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে এমনভাবে সৈন্যদের অবস্থান নির্ধারণ করলেন, যাতে শত্রুপক্ষ পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে।

এরপর তিনি পঞ্চাশজন দক্ষ তীরন্দাজকে একটি ছোট পাহাড়ে (বর্তমানে জাবালুর রুমাত) নিয়োজিত করলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা.)।

তিনি তাঁদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন,

> "তোমরা এই স্থান ছেড়ে যাবে না। আমরা বিজয়ী হই বা পরাজিত হই—যতক্ষণ না আমি নির্দেশ দিই, ততক্ষণ তোমরা এখানেই থাকবে।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৪৩

যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিমরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই কুরাইশ বাহিনী পিছু হটতে শুরু করল।

মুসলিমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে শুরু করলেন, তখন তীরন্দাজদের অধিকাংশ মনে করলেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা.) বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেন,

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এই স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।"

কিন্তু অধিকাংশ তীরন্দাজ পাহাড় ছেড়ে নিচে নেমে এলেন।

ঠিক সেই সময় কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) এই সুযোগটি কাজে লাগালেন।

তিনি পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করলেন। ফলে মুসলিমরা সামনে ও পেছন—দুই দিক থেকেই আক্রান্ত হলেন।

যুদ্ধের পরিস্থিতি মুহূর্তেই বদলে গেল।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিভ্রান্তি।

এমনকি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়ে গেছেন।

এ সংবাদ শুনে অনেক সাহাবি গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন, আবার অনেকে আরও দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> "মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র। তাঁর আগে আরও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা শহীদ হন, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে ?"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪

যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত হন।

তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়, একটি দাঁত শহীদ হয় এবং লোহার শিরস্ত্রাণের দুটি রিং তাঁর গালে ঢুকে যায়। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৭৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯০)

এমন কঠিন অবস্থাতেও তিনি নিজের জন্য প্রতিশোধের বদদোয়া করেননি। বরং বলেছিলেন,

> "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন। তারা তো জানে না।"

(অর্থগতভাবে সহিহ হাদিসে বর্ণিত। সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৪৭৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯২)

এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় চাচা হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে ওয়াহশি ইবন হারব বর্শা নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। পরে ওয়াহশি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন। (সহিহ আল–বুখারি, হাদিস: ৪০৭২)

মোট সত্তরজন সাহাবি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ শহিদদের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের আল্লাহর পথে আত্মত্যাগের সর্বোচ্চ মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

উহুদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের বহু আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন,

> "আল্লাহ অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেছিলেন, যখন তোমরা তাঁর অনুমতিতে তাদের পরাজিত করছিলে। তারপর তোমরা দুর্বল হয়ে পড়লে, আদেশ সম্পর্কে মতভেদ করলে এবং তিনি যা তোমাদের ভালো লাগছিল তা দেখানোর পর অবাধ্য হলে।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫২

উহুদের যুদ্ধ আমাদের একটি গভীর শিক্ষা দেয়—সামান্য অবাধ্যতাও কখনো কখনো বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এটি আরও শেখায়, একজন মুমিন জীবনে কখনো শুধু বিজয়ের পরীক্ষায় নয়, পরাজয় ও বিপদের পরীক্ষাতেও পড়ে। কিন্তু প্রকৃত সফলতা হলো—সব অবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা, নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং পুনরায় তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

উহুদের পরবর্তী ঘটনা: হামরাউল আসাদ অভিযান, শহিদদের মর্যাদা এবং মুনাফিকদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হওয়া।

পর্ব

২৩

উহুদের পরবর্তী ঘটনা

হামরাউল আসাদ অভিযান, শহিদদের মর্যাদা এবং মুনাফিকদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হওয়া

উহুদের যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। সত্তরজন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত হয়েছেন এবং অনেক পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ভেঙে পড়তে দেননি। বরং তিনি তাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করার ব্যবস্থা করলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ শহিদদের দাফনের নির্দেশ দিলেন।

তিনি তাঁদের গোসল না দিয়ে, রক্তমাখা কাপড়েই দাফন করতে বললেন। কারণ শহিদরা কিয়ামতের দিন তাঁদের রক্তসহ পুনরুত্থিত হবেন। সেই রক্তের রং হবে রক্তের মতো, কিন্তু সুগন্ধ হবে মিশকের মতো। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৪৩, ২৮০৩)

বিশেষভাবে তাঁর প্রিয় চাচা হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর শাহাদাতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলেন।

উহুদের পরদিনই খবর এল, কুরাইশরা আবার ফিরে এসে মদিনায় আক্রমণ করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা দিলেন,

> "শুধু তারাই আমার সঙ্গে বের হবে, যারা গতকাল উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।"

আহত হওয়া সত্ত্বেও সাহাবিরা এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। অনেকের শরীরে একাধিক ক্ষত ছিল, তবুও তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করলেন না।

মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে প্রায় আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিল।

এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছালে তারা ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল, মুসলিমরা আবার পূর্ণ শক্তি নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ফলে তারা আর মদিনার দিকে ফিরে আসার সাহস করল না; বরং দ্রুত মক্কার দিকে ফিরে গেল। (সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

এই অভিযানের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, 'মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তাই তাদের ভয় করো।' কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল। তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।'"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩

এরপর আল্লাহ বলেন,

> "অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামতসহ ফিরে এল। কোনো অকল্যাণ তাদের স্পর্শ করেনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৪

উহুদের যুদ্ধ আরেকটি সত্যকে স্পষ্ট করে দিল।

মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল যুদ্ধের আগে তিন শত লোক নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। এতে মুসলিমদের ক্ষতি হলেও আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে মুমিন ও মুনাফিকদের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> "যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের প্রকাশ করে দেন এবং মুনাফিকদেরও প্রকাশ করে দেন।"
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৭

উহুদের ঘটনার পর সাহাবিরা আরও বেশি উপলব্ধি করলেন যে, আল্লাহর আদেশের সামান্য অবহেলাও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই তারা আগের চেয়ে আরও সতর্ক, আরও অনুগত এবং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও সাহাবিদের হতাশ হতে দেননি। তিনি তাঁদের শিখিয়েছিলেন, একজন মুমিনের জীবন শুধু বিজয়ের নয়; বরং ধৈর্য, তাওবা, আত্মসমালোচনা এবং আল্লাহর ওপর অটল ভরসারও নাম।

উহুদের শিক্ষা মুসলিম সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুলল। তারা বুঝতে পারল, আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য শুধু সাহস যথেষ্ট নয়; তাঁর আদেশের পূর্ণ আনুগত্যও অপরিহার্য।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, একজন মুমিন বিপদে ভেঙে পড়ে না। সে নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং নতুন উদ্যমে সামনে এগিয়ে যায়।

এটি আরও শেখায়, আল্লাহর পথে শহিদদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। তাঁদের মৃত্যু আসলে পরাজয় নয়; বরং চিরস্থায়ী সফলতার সূচনা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
বানু নাদিরের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের নির্বাসন এবং মদিনার নিরাপত্তা রক্ষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব।

পর্ব

২৪

বানু নাদিরের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের নির্বাসন এবং মদিনার নিরাপত্তা রক্ষায় রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব

উহুদের যুদ্ধের পর মদিনার পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল। বাইরে কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত, আর ভেতরে কিছু মুনাফিক ও কয়েকটি ইহুদি গোত্র গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছিল।

এমন সময় একটি ঘটনার সূত্র ধরে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বানু নাদির গোত্রের কাছে গেলেন।

তাঁদের সঙ্গে মুসলিমদের একটি চুক্তি ছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী, একটি হত্যাকাণ্ডের রক্তপণ (দিয়াত) প্রদানের বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতা চাওয়া হয়।

প্রথমে তারা সহযোগিতার আশ্বাস দিল।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁদের একটি ঘরের দেয়ালের পাশে বসে অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু গোপনে তারা ভয়ংকর একটি ষড়যন্ত্র করল।

তারা পরিকল্পনা করল, ঘরের ছাদ থেকে একটি বড় পাথর ফেলে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-কে হত্যা করবে।

আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে ওহির মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে এ ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরবে সেখান থেকে উঠে মদিনায় ফিরে এলেন।

অল্প পরেই সাহাবিরাও তাঁর কাছে পৌঁছে পুরো বিষয়টি জানতে পারলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৩১; সীরাত ইবন হিশাম)

এটি ছিল চুক্তির প্রকাশ্য লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্র।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু নাদিরের কাছে বার্তা পাঠালেন—

তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ। তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মদিনা ত্যাগ করো।

প্রথমে তারা মদিনা ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছিল।

কিন্তু মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল গোপনে তাদের বার্তা পাঠাল,

> "তোমরা বের হয়ো না। আমরা তোমাদের সাহায্য করব।"

এই মিথ্যা আশ্বাসে তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল এবং দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। (সূরা আল-হাশর, ৫৯:১১–১২)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নিয়ে বানু নাদিরকে অবরোধ করলেন।

অবরোধ প্রায় পনেরো দিন স্থায়ী হয়।

কিন্তু যাদের ওপর তারা ভরসা করেছিল, সেই মুনাফিকরা কেউই তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল না।

অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রাণ রক্ষা করলেন এবং অনুমতি দিলেন—তারা নিজেদের উট যতটুকু বহন করতে পারে, ততটুকু সম্পদ নিয়ে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে পারবে। তবে যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

তাদের অধিকাংশ খাইবারে, আর কিছু লোক শামে চলে যায়। (সহিহ আল–বুখারি, হাদিস: ৪০২৮–৪০৩৩)

তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ ফাই (فَيْء) হিসেবে গণ্য হয়। কারণ এটি যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমদের হাতে আসে।

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন,

> "আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের কাছ থেকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া বা উট দৌড়াওনি। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলদের যাদের ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"
>
> — সূরা আল-হাশর, ৫৯:৬

এই সম্পদের বড় অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে আগত দরিদ্র মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

আনসারদের মধ্য থেকেও শুধু দুজন দরিদ্র সাহাবিকে এ সম্পদ দেওয়া হয়েছিল। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৩৩)

এ উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা মুহাজির ও আনসারদের মহান চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন,

> "এই সম্পদ সেই দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী।"
>
> — সূরা আল-হাশর, ৫৯:৮

এরপর আনসারদের সম্পর্কে বলেন,

> "তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর যারা নিজেদের অন্তরের কৃপণতা থেকে রক্ষা পায়, তারাই সফল।"
>
> — সূরা আল-হাশর, ৫৯:৯

বানু নাদিরের ঘটনা মুসলিম সমাজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিল।

ইসলাম শান্তি, ন্যায়বিচার এবং চুক্তি রক্ষার শিক্ষা দেয়। কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে চায় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াও ন্যায়বিচারের অংশ।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم প্রতিশোধের বশে নয়, বরং চুক্তি ভঙ্গ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, একজন মুমিন সর্বদা নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করবে। আবার যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের ব্যাপারে সরলতা নয়; বরং প্রজ্ঞা, সতর্কতা এবং ন্যায়বিচারের সঙ্গে আচরণ করতে হবে।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব): আরবের সম্মিলিত আক্রমণ, সালমান আল-ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে পরিখা খনন এবং আল্লাহর অলৌকিক সাহায্যে মদিনার রক্ষা।

পর্ব

২৫

খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব)

আরবের সম্মিলিত আক্রমণ, সালমান আল-ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে পরিখা খনন এবং আল্লাহর অলৌকিক সাহায্যে মদিনার রক্ষা

হিজরতের পঞ্চম বছর।

বদর ও উহুদের পরও কুরাইশরা ইসলামের অগ্রযাত্রা থামাতে পারেনি। বানু নাদির মদিনা থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর তারা খাইবারে গিয়ে কুরাইশ ও বিভিন্ন আরব গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে লাগল।

অবশেষে কুরাইশ, গাতাফান এবং আরও অনেক গোত্র মিলে প্রায় দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল জোট গঠন করল। এ কারণেই এই যুদ্ধের নাম গাযওয়াতুল আহযাব (সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ)।

মদিনায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র প্রায় তিন হাজার। এত বড় বাহিনীর সঙ্গে খোলা মাঠে যুদ্ধ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন।

এমন সময় সাহাবি সালমান আল-ফারসি (রা.) একটি নতুন পরামর্শ দিলেন।

তিনি বললেন,

> "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পারস্যে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহরের চারপাশে পরিখা খনন করতাম।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। (সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরা পরিখা খননের কাজে নেমে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও সাহাবিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাটি বহন করছিলেন। তাঁর পেটে ক্ষুধার কারণে পাথর বাঁধা ছিল, তবুও তিনি কাজ থামাননি। সাহাবিরাও কাজ করতে করতে আল্লাহর স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করতেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সঙ্গে অংশ নিতেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১০৪ ; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮০৩)

খননের সময় একটি বিশাল পাথর কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াল।

সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাকলেন।

তিনি কুঠারের প্রথম আঘাত করতেই একটি উজ্জ্বল আলো বের হলো। তিনি বললেন,

> "আমাকে শামের চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি এখনই তার প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি।"

দ্বিতীয় আঘাতে তিনি পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

তৃতীয় আঘাতে তিনি ইয়েমেন বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ১৮৭৫৭ — অর্থগতভাবে; আল-হাকিম)

সাহাবিরা তখন ক্ষুধা ও অবরোধের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সামনে ইসলামের ভবিষ্যৎ বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়ে ঈমানকে আরও দৃঢ় করে দিলেন।

অবশেষে সম্মিলিত বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছাল।

তারা পরিখা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। আরবরা আগে কখনো এমন যুদ্ধকৌশল দেখেনি।

পরিখার কারণে তারা সরাসরি শহরে প্রবেশ করতে পারল না।

অবরোধ দীর্ঘ হতে লাগল।

এ সময় মুসলিমদের খাদ্যের অভাব দেখা দিল এবং চারদিকে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

আল্লাহ তাআলা সেই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> "যখন তারা তোমাদের ওপর ওপরের দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে এসে পড়েছিল, যখন চোখগুলো স্থির হয়ে গিয়েছিল, হৃদয় কণ্ঠনালিতে পৌঁছে গিয়েছিল

> এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা ধারণা করতে শুরু করেছিলে। তখনই মুমিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।"
>
> — সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১০–১১

এই কঠিন সময়ে মুনাফিকদের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পেল।

তারা বলতে লাগল,

> "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তো প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।"

(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১২)

কিন্তু প্রকৃত মুমিনদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আল্লাহ বলেন,

> "মুমিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তখন তারা বলল, 'এটাই তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।' এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই আরও বৃদ্ধি পেল।"
>
> — সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২২

অবরোধের মধ্যে আরেকটি বড় সংকট দেখা দিল।

মদিনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযা, যারা মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল, তারা চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিল। ফলে মুসলিমরা সামনে ও পেছনে—দুই দিক থেকেই হুমকির মুখে পড়লেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের একা ছেড়ে দেননি।

তিনি প্রবল বাতাস পাঠালেন।

সেই ঝড়ে শত্রুদের তাঁবু উপড়ে গেল, হাঁড়ি-পাতিল উল্টে গেল, আগুন নিভে গেল এবং তাদের শিবিরে ভয় ছড়িয়ে পড়ল।

আল্লাহ বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন বাহিনীগুলো তোমাদের ওপর এসেছিল। তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো বাতাস এবং এমন বাহিনী পাঠিয়েছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি।"
>
> — সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৯

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলেন, আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এভাবেই একটিও বড় সম্মুখযুদ্ধ ছাড়াই আল্লাহ মুসলিমদের রক্ষা করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন,

> "আজ থেকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাব; তারা আর আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারবে না।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১১০

খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়।

এর পর থেকে কুরাইশদের শক্তি ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করে এবং মুসলিমদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, বিপদ যত বড়ই হোক, আল্লাহর ওপর ভরসা ও যথাযথ পরিকল্পনা কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াক্কুলের পাশাপাশি সর্বোত্তম কৌশলও গ্রহণ করেছিলেন।

এটি আরও শেখায়, আল্লাহর সাহায্য কখন, কীভাবে এবং কোন উপায়ে আসবে—তা মানুষ আগে থেকে বুঝতে পারে না। একজন মুমিনের কাজ হলো ধৈর্য ধরা, চেষ্টা করা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

বানু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গ, তাদের বিচার এবং মদিনায় অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের অবসান।

পর্ব

২৬

বানু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গ, তাদের বিচার এবং মদিনায় অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের অবসান

খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে কোনো বড় যুদ্ধ ছাড়াই পরাজিত করেছেন। মুসলিমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখনও বাকি ছিল।

খন্দকের অবরোধ চলাকালে বানু কুরাইযা গোত্র, যারা মদিনা সনদের অধীনে মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়েছিল।

তারা যদি শহরের ভেতর থেকে আক্রমণ করত, তাহলে নারী, শিশু ও নিরস্ত্র মানুষের জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ত।

খন্দকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্ত্র খুলে বিশ্রাম নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ঠিক তখনই জিবরীল (আ.) এসে বললেন,

> "আপনি কি অস্ত্র খুলে রেখেছেন? ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র খোলেনি। আল্লাহ আপনাকে বানু কুরাইযার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১১৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন,

> "তোমাদের কেউ যেন বানু কুরাইযার এলাকায় পৌঁছার আগে আসরের সালাত আদায় না করে।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৯৪৬

পথে আসরের সময় হয়ে গেলে সাহাবিদের মধ্যে এ নির্দেশের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ হয়।

একদল বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের বাহ্যিক অর্থই পালন করতে হবে; তাই গন্তব্যে পৌঁছে সালাত পড়বেন।

অন্যদল বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত পৌঁছানো; তাই সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করাই উচিত।

পরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উত্থাপিত হলে তিনি কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি। এ ঘটনা দেখায়, দলিলভিত্তিক ইজতিহাদে ভিন্নমত হলে পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা উচিত। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৯৪৬)

মুসলিম বাহিনী বানু কুরাইযার দুর্গ অবরোধ করল।

প্রায় পঁচিশ দিন অবরোধ চলার পর তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। (সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

বানু কুরাইযা চাইছিল, তাদের বিচার যেন তাদের মিত্র আওস গোত্রের একজন নেতার মাধ্যমে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই আবেদন গ্রহণ করলেন।

বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হলো সা'দ ইবন মু'আয (রা.)-কে। তিনি উহুদের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং খন্দকের যুদ্ধেও তাঁর ক্ষত গুরুতর হয়ে উঠেছিল।

সা'দ (রা.) রায় দিলেন—যারা রাষ্ট্রদ্রোহ, যুদ্ধকালীন চুক্তিভঙ্গ এবং শত্রুর সঙ্গে সামরিক ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে সে সময়কার শরিয়ত ও যুদ্ধবিধান অনুযায়ী বিচার কার্যকর হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

> "তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সাত আসমানের ওপর থেকে দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার করেছ।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১২১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৮

এ বিচার কোনো গোত্র বা ধর্মের কারণে করা হয়নি; বরং যুদ্ধকালীন চুক্তিভঙ্গ, রাষ্ট্রদ্রোহ এবং শত্রুপক্ষকে সহায়তা করার অপরাধের ভিত্তিতে করা হয়েছিল।

এই ঘটনার মাধ্যমে মদিনার ভেতরের সবচেয়ে বড় সামরিক ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটে এবং মুসলিম সমাজ আরও নিরাপদ হয়ে ওঠে।

কিছুদিন পর সা'দ ইবন মু'আয (রা.) তাঁর আহত ক্ষতের কারণেই ইন্তিকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন,

> "সা'দ ইবন মু'আযের মৃত্যুর কারণে আরশ কেঁপে উঠেছে।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৮০৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪৬৬

এটি ছিল তাঁর ঈমান, ত্যাগ ও মর্যাদার এক অসাধারণ স্বীকৃতি।

বানু কুরাইযার ঘটনার পর মদিনার অভ্যন্তরে বড় ধরনের সামরিক হুমকি কার্যত শেষ হয়ে যায়।

এখন মুসলিমরা বাইরের দাওয়াত ও ইসলামের বিস্তারের দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেলেন।

এই ঘটনা আমাদের শেখায়, ইসলাম চুক্তি পালনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। কিন্তু কেউ যদি যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে নিরীহ মানুষের জীবন বিপন্ন করে, তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

এটি আরও শেখায়, বিচার কখনো আবেগ বা প্রতিশোধের ভিত্তিতে নয়; বরং প্রমাণ, চুক্তি এবং ন্যায়নীতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
হুদাইবিয়ার সন্ধি: আপাতদৃষ্টিতে কঠিন শর্ত, কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এক মহাবিজয়ের সূচনা।

পর্ব

২৭

হুদাইবিয়ার সন্ধি

আপাতদৃষ্টিতে কঠিন শর্ত, কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এক মহাবিজয়ের সূচনা

হিজরতের ষষ্ঠ বছর।

খন্দকের যুদ্ধের পর আরবের পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। কুরাইশরা বুঝতে পেরেছিল, ইসলামকে শক্তি দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মুসলিম সমাজও আগের চেয়ে অনেক সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল।

এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি স্বপ্ন দেখলেন।

তিনি দেখলেন, তিনি ও তাঁর সাহাবিরা নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে উমরাহ পালন করছেন।

এই স্বপ্ন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ।

আল্লাহ পরে বলেন,

> "অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে—মাথা মুণ্ডন করে অথবা চুল ছোট করে, কোনো ভয় ছাড়াই।"
>
> — সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় এক হাজার চারশত সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে উমরাহর উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে রওনা হলেন। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধের অস্ত্র ছিল না; শুধু সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ তরবারি ছিল। তাঁরা কুরবানির পশুও সঙ্গে নিয়েছিলেন, যাতে সবাই বুঝতে পারে—তাঁদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয়, ইবাদত। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১৫২; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮৩)

কুরাইশরা এ সংবাদ শুনে মুসলিমদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

তখন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم প্রধান রাস্তা এড়িয়ে হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

তিনি সংঘর্ষ এড়াতে বারবার কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করলেন।

এক পর্যায়ে তিনি উসমান ইবন আফফান (রা.)-কে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠালেন।

উসমান (রা.)-এর ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় মুসলিমদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এ সংবাদে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم একটি গাছের নিচে সাহাবিদের কাছ থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অবিচল থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

ইতিহাসে এটি বাইআতুর রিদওয়ান নামে পরিচিত।

আল্লাহ তাআলা এ বাইআতের প্রশংসা করে বলেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইআত করছিল। তিনি জানতেন তাদের অন্তরে কী ছিল। তাই তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় দান করেছেন।"
>
> — সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১৮

এর কিছুক্ষণ পর জানা গেল, উসমান (রা.) নিহত হননি।

অবশেষে কুরাইশদের প্রতিনিধি হিসেবে সুহাইল ইবন আমর আলোচনায় এলেন।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-কে সন্ধিপত্র লিখতে বললেন।

তিনি লিখতে শুরু করলেন—

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।"

কিন্তু সুহাইল বলল,

"আমরা 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহিম' জানি না। লিখুন—'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'।"

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم শান্তভাবে তা মেনে নিলেন।

এরপর লেখা হলো—

"এটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের সঙ্গে সুহাইল ইবন আমরের চুক্তি।"

সুহাইল আপত্তি জানিয়ে বলল,

"আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল মানতাম, তবে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। লিখুন —'মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ'।"

আলী (রা.) এ শব্দ মুছতে সংকোচ বোধ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তা মুছে "মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ" লিখিয়ে দিলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৬৯৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮৩)

সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল—

এ বছর মুসলিমরা উমরাহ না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন।

পরের বছর তাঁরা এসে তিন দিন অবস্থান করে উমরাহ করতে পারবেন।

দশ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি থাকবে।

আরবের যে কোনো গোত্র ইচ্ছা করলে মুসলিমদের বা কুরাইশদের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারবে।

মক্কা থেকে কেউ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মদিনায় গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে; তবে মদিনা থেকে কেউ মক্কায় গেলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

এই শর্তগুলো শুনে অনেক সাহাবি অত্যন্ত কষ্ট পেলেন।

বিশেষ করে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন,

> "আমরা কি সত্যের ওপর নই? তাহলে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এ রকম ছাড় কেন?"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৭৩১

রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তভাবে বললেন,

> "আমি আল্লাহর রাসূল। আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হই না। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৭৩১

ঠিক সেই সময় আরেকটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটল।

মক্কায় নির্যাতিত মুসলিম আবু জান্দাল ইবন সুহাইল (রা.) শিকল পরা অবস্থায় পালিয়ে মুসলিমদের শিবিরে এসে পৌঁছালেন।

কিন্তু সন্ধি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় তাঁর পিতা সুহাইল দাবি করল, তাঁকে ফেরত দিতে হবে।

সাহাবিদের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত কষ্টের মুহূর্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জান্দাল (রা.)-কে বললেন,

> "ধৈর্য ধারণ করো এবং সওয়াবের আশা রাখো। আল্লাহ অবশ্যই তোমার এবং তোমার মতো দুর্বল মুমিনদের জন্য মুক্তির পথ তৈরি করবেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৭৩১

বাহ্যিকভাবে এ সন্ধি মুসলিমদের জন্য কঠিন মনে হলেও, আল্লাহ তাআলা একে "সুস্পষ্ট বিজয়" বলে ঘোষণা করলেন।

তিনি বলেন,

> "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"
>
> — সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ নিরাপদে একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। এর ফলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং আগের সব সময়ের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

হুদাইবিয়ার ঘটনা আমাদের শেখায়, সব বিজয় তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায় না। অনেক সময় আল্লাহ এমন দরজা খুলে দেন, যা প্রথমে কঠিন মনে হলেও পরবর্তীতে তা বিরাট কল্যাণের কারণ হয়।

এটি আরও শেখায়, একজন মুমিন আবেগ নয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুসরণ করে। কারণ আল্লাহর সিদ্ধান্তের পেছনে এমন প্রজ্ঞা থাকে, যা মানুষ প্রথমে বুঝতে পারে না।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
খাইবার বিজয়: দুর্গসমূহ জয়, আলী (রা.)-এর বীরত্ব এবং ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রকাশ।

পর্ব

২৮

খাইবার বিজয়

দুর্গসমূহ জয়, আলী (রা.)-এর বীরত্ব এবং ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রকাশ

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মুসলিমরা উত্তরাঞ্চলের সেই শক্তির দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেলেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল।

তাদের অন্যতম ছিল খাইবারের ইহুদি বসতি।

মদিনা থেকে নির্বাসিত বানু নাদির-এর অনেক নেতা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তারাই বিভিন্ন আরব গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিল এবং খন্দকের যুদ্ধের অন্যতম পরিকল্পনাকারী ছিল।

হিজরতের সপ্তম বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় এক হাজার চারশত সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে খাইবারের উদ্দেশে রওনা হলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১৯৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮০২)

খাইবার ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অঞ্চল।

সেখানে একাধিক সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। তাই মুসলিমদের জন্য এটি সহজ যুদ্ধ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরবেলা খাইবারের নিকটে পৌঁছালেন।

স্থানীয় লোকেরা মাঠে কাজ করতে বের হয়ে মুসলিম বাহিনীকে দেখে চিৎকার করে বলল,

> "মুহাম্মাদ এসে গেছেন! সৈন্যবাহিনী এসে গেছে!"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> "আল্লাহু আকবার! খাইবার ধ্বংস হোক। যখন আমরা কোনো জাতির প্রান্তরে অবতরণ করি, তখন সতর্কীকৃতদের সকাল কতই না মন্দ হয়!"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৯৪৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৬৫

এরপর একে একে দুর্গগুলো অবরোধ করা শুরু হলো।

কিছু দুর্গ মুসলিমরা জয় করলেও সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গগুলোর একটি সহজে বিজিত হচ্ছিল না।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিলেন,

> "আগামীকাল আমি এমন একজনের হাতে পতাকা দেব, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাঁর হাত দিয়েই বিজয় দান করবেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭০১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০৬

সাহাবিরা সবাই আশা করছিলেন, পতাকাটি হয়তো তাঁর হাতেই দেওয়া হবে।

পরদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন,

> "আলী কোথায়?"

জানানো হলো, তাঁর চোখে ব্যথা।

তখন তাঁকে ডেকে আনা হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে নিজের লালা মুবারক লাগিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল, যেন আগে কখনো কোনো ব্যথাই ছিল না। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০৬)

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা আলী ইবন আবি তালিব (রা.)-এর হাতে তুলে দিলেন।

তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন,

> "ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও। তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দিকে আহ্বান করো এবং আল্লাহ তাদের ওপর যে অধিকার নির্ধারণ করেছেন, তা জানিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হিদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০৬

এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের মহান নীতি।

তিনি যুদ্ধের আগে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান জানাতেন। যুদ্ধ কখনো তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল না; বরং মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করলেন।

খাইবারের দুর্গগুলো একে একে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল।

স্থানীয় অধিবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন করল, তারা যেন নিজেদের জমিতে থেকেই কৃষিকাজ করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সেই অনুমতি দিলেন। শর্ত ছিল, উৎপাদিত ফসলের একটি নির্ধারিত অংশ মুসলিমদের দেওয়া হবে। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৩২৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৫৫১)

এ থেকেই বোঝা যায়, বিজয়ের পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ ন্যায়বিচার ও বাস্তবসম্মত নীতির অনুসরণ করতেন।

খাইবার বিজয়ের পর মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে উত্তর আরবেও ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

এই অভিযানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

জাফর ইবন আবি তালিব (রা.) দীর্ঘদিন আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পর ফিরে আসেন।

তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন,

> "আমি বুঝতে পারছি না, কোনটি আমাকে বেশি আনন্দিত করেছে—খাইবার বিজয়, নাকি জাফরের আগমন!"
>
> — সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৫২১৮; হাসান

খাইবারের ঘটনা আমাদের শেখায়, ইসলামের প্রকৃত শক্তি শুধু যুদ্ধজয়ে নয়; বরং আল্লাহর প্রতি ঈমান, ন্যায়বিচার এবং দাওয়াতের মহান আদর্শে নিহিত।

এটি আরও শেখায়, একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। কারণ একজন মানুষের হিদায়াত, দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের চেয়েও উত্তম।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
বিশ্বের শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত: হেরাক্লিয়াস, কিসরা, মুকাওকিস ও অন্যান্য শাসকদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐতিহাসিক পত্র।

পর্ব

২৯

বিশ্বের শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত

হেরাক্লিয়াস, কিসরা, মুকাওকিস ও অন্যান্য শাসকদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐতিহাসিক পত্র

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আরব উপদ্বীপে তুলনামূলক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু আরবের গোত্রগুলোর কাছেই নয়, বিশ্বের শক্তিশালী শাসকদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কারণ তাঁর রিসালাত কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা অঞ্চলের জন্য ছিল না; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৮

আরও বলেন,

> "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"
>
> — সূরা সাবা, ৩৪:২৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন শাসকের কাছে চিঠি পাঠানোর জন্য একটি রূপার মোহর তৈরি করালেন। তাতে তিনটি লাইনে লেখা ছিল—



অর্থাৎ, "মুহাম্মাদ, আল্লাহর রাসূল।"

কারণ সে সময় অনেক শাসক মোহরযুক্ত চিঠি ছাড়া সরকারি পত্র গ্রহণ করতেন না। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৮৭২)

হেরাক্লিয়াসের কাছে পত্র

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم সাহাবি দিহইয়াহ আল-কালবি (রা.)-এর মাধ্যমে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস-এর কাছে একটি পত্র পাঠালেন।

চিঠির শুরুতে লেখা ছিল—

> "পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের মহান নেতা হেরাক্লিয়াসের প্রতি। যে ব্যক্তি হিদায়াতের অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে আপনার অধীনস্থদের গুনাহও আপনার ওপর বর্তাবে।"

এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত উল্লেখ করেন—

> "হে কিতাবধারীগণ! এমন একটি কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান—আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না..."
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৬৪

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৩)

হেরাক্লিয়াস চিঠিটি গুরুত্বের সঙ্গে পড়লেন।

তিনি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি মক্কা থেকে আগত আবু সুফিয়ান (তখনও মুসলিম হননি)-কে ডেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন।

আবু সুফিয়ান সত্য গোপন করতে চাইলেও লজ্জার কারণে মিথ্যা বলতে পারেননি।

সব কথা শোনার পর হেরাক্লিয়াস বললেন,

> "তুমি যা বলেছ, তা সত্য হলে তিনি অবশ্যই একজন নবী। আমি জানতাম, একজন নবী আগমন করবেন; কিন্তু তিনি আরবদের মধ্য থেকে হবেন, তা ভাবিনি।"

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭)

তবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি; কারণ তিনি নিজের রাজত্ব হারানোর আশঙ্কা করেছিলেন।

পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে পত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহমি (রা.)-এর মাধ্যমে পারস্য সম্রাট কিসরা (খসরু দ্বিতীয়)-এর কাছে চিঠি পাঠালেন।

কিন্তু কিসরা অহংকারবশত চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলল।

এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন,

> "আল্লাহ তার রাজত্বও টুকরো টুকরো করে দিন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪২৪

কিছুদিনের মধ্যেই কিসরার নিজের পুত্র তাকে হত্যা করে এবং পারস্য সাম্রাজ্যে অস্থিরতা শুরু হয়। পরবর্তীতে পুরো পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিমদের অধীনে আসে।

মিশরের শাসক মুকাওকিসের কাছে পত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতিব ইবন আবি বালতা'আ (রা.)-এর মাধ্যমে মিশরের শাসক মুকাওকিস-এর কাছে পত্র পাঠালেন।

মুকাওকিস অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দূতকে গ্রহণ করলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি; তবে চিঠির সম্মান রক্ষা করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উপহার পাঠান।

এই উপহারের মধ্যে ছিলেন মারিয়া আল-কিবতিয়্যা (রা.), যিনি পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে আসেন এবং তাঁর ঘরে ইবরাহিম নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৩১৫)

আবিসিনিয়ার নাজাশির কাছে পত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবিসিনিয়ার ন্যায়পরায়ণ শাসক নাজাশি (আসহামা)-এর কাছেও পত্র পাঠান।

তিনি ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং ঈমান আনেন। যদিও তিনি নিজের দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম ঘোষণা করতে পারেননি। (মুসনাদ আহমাদ; ইবন হিব্বান)

নাজাশি মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় তাঁর জন্য গায়েবানা জানাজা আদায় করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৩৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৯৫১)

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইন, ইয়ামামা, ওমানসহ আরও বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন।

কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন, কেউ সৌজন্যমূলক উত্তর দেন, আবার কেউ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এই ঘটনাগুলো স্পষ্ট করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত কোনো জাতি, বর্ণ বা ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত শেষ রাসূল।

এই পর্ব আমাদের শেখায়, একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো প্রজ্ঞা, উত্তম চরিত্র এবং সুন্দর ভাষায় মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দেওয়া। হিদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ, আর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া নবীদের সুন্নাহ।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

মু'তার যুদ্ধ: ইসলামের প্রথম রোমান সাম্রাজ্যের মুখোমুখি সংঘর্ষ, তিন সেনাপতির শাহাদাত এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)-এর অসাধারণ নেতৃত্ব।

পর্ব

৩০

মু'তার যুদ্ধ

ইসলামের প্রথম রোমান সাম্রাজ্যের মুখোমুখি সংঘর্ষ, তিন সেনাপতির শাহাদাত এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)-এর অসাধারণ নেতৃত্ব

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলামের দাওয়াত আরব উপদ্বীপের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন শাসকের কাছে দূত পাঠাচ্ছিলেন, যাতে তারা আল্লাহর একত্ববাদের বার্তা জানতে পারে।

এ সময় একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত হারিস ইবন উমাইর আল-আযদী (রা.)-কে শামের বুসরা অঞ্চলের শাসকের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু পথে মু'তার নিকটবর্তী এলাকার শাসক শুরাহবীল ইবন আমর আল-গাসসানী তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

সে সময় দূত হত্যা আন্তর্জাতিক রীতিনীতিরও গুরুতর লঙ্ঘন ছিল। (সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ)

এর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের অষ্টম বছরে তিন হাজার সাহাবির একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এটি ছিল তৎকালীন মুসলিমদের সবচেয়ে বড় সেনাদল।

যাত্রার আগে তিনি তিনজন সেনাপতিকে ধারাবাহিকভাবে নির্ধারণ করে দিলেন।

তিনি বললেন,

> "সেনাপতি হবে যায়েদ ইবন হারিসা। যদি তিনি শহীদ হন, তবে জাফর ইবন আবি তালিব। আর যদি তিনিও শহীদ হন, তবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা নেতৃত্ব দেবেন।"

> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৬১

মুসলিম বাহিনী মু'তা এলাকায় পৌঁছে জানতে পারল, তাদের সামনে রয়েছে রোমান (বাইজেন্টাইন) বাহিনী এবং তাদের মিত্র আরব গোত্রগুলোর বিশাল সেনাদল।

বর্ণনাগুলোতে শত্রু বাহিনীর সংখ্যা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক সূত্রে প্রায় এক লক্ষ বা দুই লক্ষ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব সংখ্যা নিশ্চিতভাবে সহিহ হাদিসে প্রমাণিত নয়। যা নিশ্চিত, তা হলো—শত্রুপক্ষ মুসলিমদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল।

সাহাবিরা পরিস্থিতি নিয়ে পরামর্শ করলেন।

কেউ কেউ মদিনায় সংবাদ পাঠানোর প্রস্তাব দিলেন।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বললেন,

> "হে আমার জাতি! তোমরা তো সেই বস্তুরই সন্ধানে বের হয়েছ, যা তোমরা ভালোবাসো—শাহাদাত। আমরা সংখ্যার জোরে নয়; আল্লাহ আমাদের যে দ্বীনের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, তার শক্তিতেই যুদ্ধ করি।"

এরপর মুসলিম বাহিনী দৃঢ় ঈমান নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল।

প্রথমে পতাকা হাতে ছিলেন যায়েদ ইবন হারিসা (রা.)।

তিনি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন।

এরপর পতাকা তুলে নিলেন জাফর ইবন আবি তালিব (রা.)।

তিনি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। এক পর্যায়ে তাঁর ডান হাত কেটে যায়। তখন তিনি বাম হাতে পতাকা ধরলেন। বাম হাতও কেটে গেলে তিনি দুই বাহুর সাহায্যে পতাকাটি বুকে আঁকড়ে রাখলেন, যতক্ষণ না শাহাদাত বরণ করেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৬১)

পরে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم তাঁর সম্পর্কে বলেন,

> "আমি জান্নাতে জাফরকে দেখেছি। আল্লাহ তাঁর দুটি হাতের পরিবর্তে তাঁকে দুটি ডানা দিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছেন।"

> — সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৬৩; হাসান-সহিহ

তাই তিনি "জাফর আত-তাইয়ার" (ডানাওয়ালা জাফর) নামে পরিচিত হন।

এরপর পতাকা হাতে নিলেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)।

তিনি কিছুক্ষণ নিজের নফসকে শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত করলেন, তারপর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।

মদিনায় অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছিলেন।

তিনি সাহাবিদের বললেন,

> "এখন যায়েদ পতাকা নিয়েছেন এবং তিনি শহীদ হয়েছেন। তারপর জাফর পতাকা নিয়েছেন এবং তিনিও শহীদ হয়েছেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা নিয়েছেন এবং তিনিও শহীদ হয়েছেন।"

এ কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৬২)

তিন সেনাপতির শাহাদাতের পর সাহাবিরা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.)-কে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন।

তিনি তখন সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

খালিদ (রা.) অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করলেন।

তিনি সেনাবাহিনীর অবস্থান পরিবর্তন করলেন, যাতে শত্রুরা মনে করে নতুন বাহিনী এসে পৌঁছেছে।

পরদিন তিনি সুশৃঙ্খলভাবে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে প্রত্যাহার করে আনলেন।

এভাবে তিনি মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরে তাঁকে উপাধি দিলেন—

> "সাইফুল্লাহ" — অর্থাৎ "আল্লাহর তরবারি।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৬২

মু'তার যুদ্ধ সামরিকভাবে কোনো নিরঙ্কুশ বিজয় ছিল না। কিন্তু এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

প্রথমবারের মতো মুসলিমরা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্য রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হয়ে ঈমান, সাহস ও কৌশলের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহস, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের সক্ষমতা সমগ্র অঞ্চলে সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

মু'তার যুদ্ধ আমাদের শেখায়, আল্লাহর পথে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করা সর্বোচ্চ সম্মানের বিষয়।

এটি আরও শেখায়, একজন প্রকৃত নেতা শুধু বিজয়ের সময় নয়; সংকটের মুহূর্তেও প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে উম্মাহকে রক্ষা করেন।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
মক্কা বিজয়: প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা; তাওহীদের বিজয় এবং কাবা থেকে মূর্তি অপসারণ।

পর্ব

৩১

মক্কা বিজয়

প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা; তাওহীদের বিজয় এবং কাবা থেকে মূর্তি অপসারণ

হিজরতের অষ্টম বছর।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি স্থির হয়েছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কুরাইশের মিত্র বানু বকর গোত্র মুসলিমদের মিত্র বানু খুযাআ গোত্রের ওপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে কুরাইশের কিছু লোকও গোপনে অস্ত্র ও সহযোগিতা প্রদান করে।

এর মাধ্যমে হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ হয়ে যায়। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৭৩১; ইবন হিশাম)

বানু খুযাআর প্রতিনিধি আমর ইবন সালিম (রা.) মদিনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

> "হে আমর ইবন সালিম! তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।"

তিনি বুঝতে পারলেন, এখন মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় এসেছে।

তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, যাতে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত না ঘটে।

আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করলেন,

> "হে আল্লাহ! কুরাইশদের কাছ থেকে আমাদের অগ্রযাত্রার সংবাদ গোপন রাখুন।"

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৭৭)

রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় দশ হাজার সাহাবিকে নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলেন। এটি তখন পর্যন্ত মুসলিমদের সবচেয়ে বড় বাহিনী ছিল।

পথে মাররুয-যাহরান নামক স্থানে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন এবং রাতে হাজার হাজার আগুন জ্বালানো হলো।

এ দৃশ্য দেখে কুরাইশরা বুঝতে পারল, এক বিশাল বাহিনী এসে গেছে।

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর উদ্যোগে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্মান রক্ষার্থে ঘোষণা করলেন,

> "যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি নিজের ঘরে অবস্থান করবে, সে নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮০

এ ঘোষণা থেকে স্পষ্ট ছিল—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়; বরং শান্তিপূর্ণভাবে মক্কায় প্রবেশ।

মুসলিম বাহিনী চারটি দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন—

> "তোমাদের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ না করলে, তোমরাও যুদ্ধ করবে না।"

ফলে অল্প কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ছাড়া প্রায় রক্তপাতহীনভাবেই মক্কা বিজিত হলো। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৮৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী হয়েও পরম বিনয় ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি এতটাই মাথা নত করেছিলেন যে, তাঁর থুতনি উটের জিন স্পর্শ করছিল। (আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন, ইমাম হাকিম, হাদিস: ৪৩৬৫)

বিজয়ী সেনাপতির মতো অহংকার নয়; বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাই ছিল তাঁর অন্তরে।

তিনি কাবা শরিফে প্রবেশ করলেন।

সেখানে তখন প্রায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল।

তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে একের পর এক মূর্তি ভেঙে দিচ্ছিলেন এবং তিলাওয়াত করছিলেন—

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

অর্থ: "বলুন, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮১)

আরও তিলাওয়াত করলেন,

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾

অর্থ: "সত্য এসে গেছে। আর মিথ্যা না কিছু শুরু করতে পারে, না কিছু ফিরিয়ে আনতে পারে।" (সূরা সাবা, ৩৪:৪৯)

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৮৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮১)

এরপর তিনি কাবাঘরের ভেতরে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৭)

এরপর কুরাইশদের সবাইকে কাবার সামনে সমবেত করা হলো।

যারা একসময় তাঁকে নির্যাতন করেছিল, মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছিল, তাঁর সাহাবিদের হত্যা করেছিল—তারা আজ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন,

> "তোমাদের কী ধারণা, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করব ?"

তারা বলল,

> "আপনি একজন সম্মানিত ভাই এবং একজন সম্মানিত ভাইয়ের পুত্র।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথার অনুকরণে বললেন,

> "আজ তোমাদের ওপর কোনো ভর্ৎসনা নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।"

(সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ। অর্থটি সূরা ইউসুফ, ১২:৯২-এর ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।)

এই সাধারণ ক্ষমা মানব ইতিহাসের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

যারা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর বিরোধিতা করেছিল, তাঁদের অধিকাংশকেই তিনি ক্ষমা করে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কাবা আবার তাওহীদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করল।

মক্কা বিজয় আমাদের শেখায়, প্রকৃত বিজয় প্রতিশোধে নয়; বরং ন্যায়, দয়া ও ক্ষমায়।

এটি আরও শেখায়, আল্লাহ যখন বিজয় দান করেন, তখন একজন মুমিনের কর্তব্য অহংকার করা নয়; বরং বিনয়ী হওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অভিযান: সংখ্যার অহংকারের শিক্ষা, আল্লাহর সাহায্য এবং শত্রুর জন্যও দয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত।

পর্ব

৩২

হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অভিযান

সংখ্যার অহংকারের শিক্ষা, আল্লাহর সাহায্য এবং শত্রুর জন্যও দয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত

মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবজুড়ে ইসলামের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু সব গোত্র তা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের নেতারা আশঙ্কা করল, মক্কা বিজয়ের পর তাদের পালাও আসতে পারে। তাই তারা আগে থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। তাদের নেতা ছিলেন মালিক ইবন আওফ আন-নাসরী।

তিনি যোদ্ধাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তাদের পরিবার, নারী-শিশু এবং সম্পদও সঙ্গে নিয়ে আসেন, যাতে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৫৯; সীরাত ইবন হিশাম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে প্রায় বারো হাজার সাহাবিকে নিয়ে হুনাইনের দিকে রওনা হলেন। এর মধ্যে দশ হাজার ছিলেন মদিনা থেকে আগত এবং দুই হাজার ছিলেন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মক্কাবাসী।

এটি ছিল মুসলিমদের ইতিহাসে তখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বাহিনী।

পথে কিছু লোক বলতে লাগলেন,

> "আজ এত বড় বাহিনী থাকার কারণে আমরা কখনো পরাজিত হব না।"

যদিও এ কথা সবাই বলেননি, তবুও সংখ্যার ওপর নির্ভরতার এই মনোভাব আল্লাহ পছন্দ করলেন না।

ভোরবেলায় মুসলিম বাহিনী হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করতেই শত্রুরা পাহাড়ের আড়াল থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালাল।

হঠাৎ চারদিক থেকে তীর বর্ষিত হতে লাগল।

সামনের সারির অনেক মুসলিম বিচলিত হয়ে পিছিয়ে গেলেন।

এই কঠিন মুহূর্তের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

> "আল্লাহ বহু স্থানে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের দিনও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তারপর তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পালিয়েছিলে।"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:২৫

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুহূর্তের জন্যও নিজের অবস্থান ত্যাগ করেননি।

তিনি তাঁর সাদা খচ্চরের ওপর অটল দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.) খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবন হারিস (রা.) পাশে ছিলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

> «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»

অর্থ: "আমি নবী—এতে কোনো মিথ্যা নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৮৬৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৫)

এরপর তিনি আব্বাস (রা.)-কে উচ্চস্বরে সাহাবিদের ডাকতে বললেন।

আব্বাস (রা.) উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করলেন,

> "হে বাইআতুর রিদওয়ানের সাহাবিগণ! হে সূরা আল-বাকারার অনুসারীরা!"

এ ডাক শুনে সাহাবিরা একে একে ফিরে আসতে লাগলেন।

তারা বললেন,

> "লাব্বাইক! আমরা উপস্থিত।"

মুহূর্তের মধ্যেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে গেল।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন সাহায্য পাঠালেন, যা মানুষ দেখতে পায়নি।

আল্লাহ বলেন,

> "এরপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি।"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:২৬

অবশেষে হাওয়াযিন ও সাকীফ বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

মুসলিমরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করলেন। বন্দিদের সংখ্যাও ছিল অনেক।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফ নগরীর দিকে অগ্রসর হলেন, কারণ সাকীফ গোত্র সেখানে দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিল।

তায়েফের দুর্গ অত্যন্ত মজবুত ছিল।

মুসলিমরা কয়েক সপ্তাহ অবরোধ করলেও দুর্গ ভেদ করা সম্ভব হলো না।

তখন কিছু সাহাবি বললেন,

> "হে আল্লাহর রাসূল! সাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে বদদোয়া করুন।"

কিন্তু রহমতের নবী ﷺ বদদোয়া না করে দোয়া করলেন,

> "হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং তাদের আমার কাছে নিয়ে আসুন।"
>
> — সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৯৪২; হাসান

কিছুদিন পর তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে মদিনায় ফিরে এলেন।

পরবর্তীতে সাকীফ গোত্র নিজেরাই প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন মুসলিমদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাঁদের কাউকে কাউকে বেশি অংশ প্রদান করলেন। এদেরকে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বলা হয়।

এতে কিছু আনসার সাহাবির মনে সাময়িক প্রশ্ন জাগলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের একত্রিত করে বললেন,

> "তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মানুষ উট-ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরবে ?"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৩৩০ ; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬১

এ কথা শুনে আনসার সাহাবিদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল।

তাঁরা বললেন,

> "আমরা আল্লাহর রাসূলকেই আমাদের অংশ হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।"

হুনাইনের ঘটনা আমাদের শেখায়, বিজয় কখনো সংখ্যা, অস্ত্র বা শক্তির ওপর নির্ভর করে না; প্রকৃত বিজয় আসে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে।

এটি আরও শেখায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সত্যিই রহমাতুল্লিল আলামীন। যারা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, তাদের জন্যও তিনি হিদায়াতের দোয়া করেছিলেন, প্রতিশোধের নয়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
তাবুক অভিযান: কঠিন সময়ের পরীক্ষা, মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন এবং তিন সাহাবির তাওবার ঐতিহাসিক ঘটনা।

পর্ব

৩৩

তাবুক অভিযান

কঠিন সময়ের পরীক্ষা, মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন এবং তিন সাহাবির তাওবার ঐতিহাসিক ঘটনা

হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অভিযানের পর আরব উপদ্বীপে ইসলামের শক্তি আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এ সময় সংবাদ এলো যে, উত্তর সীমান্তে রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্য ও তাদের মিত্র আরব গোত্রগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভাব্য এই হুমকি মোকাবিলার জন্য হিজরতের নবম বছরে তাবুক অভিমুখে অভিযানের ঘোষণা দিলেন।

এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন সময়।

প্রচণ্ড গরম, দীর্ঘ পথ, পানির সংকট এবং ফল সংগ্রহের মৌসুম—সব মিলিয়ে অনেকের কাছেই এ অভিযানে অংশ নেওয়া ছিল বড় পরীক্ষা।

এ কারণেই এ অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলিম বাহিনী ইতিহাসে "জাইশুল উসরাহ" (কষ্টের বাহিনী) নামে পরিচিত। আল্লাহ তাআলা এ অভিযানের কঠিন পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

> "আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ (তাওবা কবুল) করেছেন—যারা সংকটের সময়ে তাঁর অনুসরণ করেছিল, যখন তাদের একদলের অন্তর প্রায় বিচ্যুত হয়ে পড়ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি পরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের আল্লাহর পথে দান করার আহ্বান জানালেন।

সাহাবিরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী উদারভাবে সহযোগিতা করলেন।

উসমান ইবন আফফান (রা.) এক হাজার উট, একশত ঘোড়া এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ দান করেন।

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,

> "আজকের পর উসমান যা-ই করুন না কেন, তা তাঁর কোনো ক্ষতি করবে না।"
>
> — সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭০১; হাসান

আবু বকর (রা.) নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে এলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

> "তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?"

তিনি বললেন,

> "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে।"

অন্যদিকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নিজের সম্পদের অর্ধেক দান করেছিলেন। (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ১৬৭৮)

এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য অনেক দরিদ্র সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাহন চেয়েছিলেন।

কিন্তু পর্যাপ্ত বাহন না থাকায় তিনি দিতে পারেননি।

তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেন,

> "তাদের ওপরও কোনো দোষ নেই, যারা আপনার কাছে এসেছিল বাহন পাওয়ার জন্য। আপনি যখন বললেন, 'তোমাদের বহন করার মতো কিছু আমার কাছে নেই',

> তখন তারা ফিরে গেল, আর তাদের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল—এ কারণে যে, তারা ব্যয় করার মতো কিছুই পাচ্ছিল না।"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:৯২

অন্যদিকে মুনাফিকরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকল।

কেউ বলল,

> "এই গরমে বের হয়ো না।"

তখন আল্লাহ তাআলা বললেন,

> "বলুন, জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও অধিক উত্তপ্ত—যদি তারা বুঝত!"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:৮১

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় ত্রিশ হাজার সাহাবিকে নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এটি ছিল তাঁর নেতৃত্বে সর্ববৃহৎ মুসলিম বাহিনী। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪১৮)

মুসলিম বাহিনী তাবুকে পৌঁছানোর পর দেখা গেল, রোমান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে আসেনি।

ফলে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

তবে আশপাশের অনেক গোত্র ও শাসক মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাব উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মদিনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, যারা বিনা কারণে অভিযানে অংশ নেয়নি, তারা বিভিন্ন অজুহাত দিতে এসেছে।

তিনি তাদের বাহ্যিক বক্তব্য গ্রহণ করলেন এবং তাদের অন্তরের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪১৮)

কিন্তু তিনজন সত্যবাদী সাহাবি—কা'ব ইবন মালিক (রা.), মুরারাহ ইবন রাবী' (রা.) এবং হিলাল ইবন উমাইয়াহ (রা.)—কোনো মিথ্যা অজুহাত দিলেন না।

তারা অকপটে নিজেদের ভুল স্বীকার করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করলেন।

তিনি মুসলিমদের নির্দেশ দিলেন, সাময়িকভাবে তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ রাখতে।

পুরো পঞ্চাশ দিন তাঁরা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেলেন।

তারা আন্তরিকভাবে তাওবা করতে থাকলেন এবং আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়লেন না।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদের তাওবা কবুল করলেন।

তিনি বলেন,

> "আর তিনি সেই তিনজনের তাওবাও কবুল করেছেন, যারা পিছিয়ে ছিল... তারপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, যাতে তারা তাওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৮

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সুসংবাদ দিলেন।

কা'ব ইবন মালিক (রা.) আনন্দে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন,

> "তোমার জন্মের পর থেকে আজকের দিনটি তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪১৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৬৯

তাবুক অভিযান আমাদের শেখায়, আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কষ্ট ছাড়া বড় সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

এটি আরও শেখায়, মিথ্যা অজুহাত সাময়িকভাবে মানুষকে বাঁচাতে পারে, কিন্তু সত্যবাদিতা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি এনে দেয়।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:
বিদায় হজ ও বিদায় ভাষণ: মানবাধিকার, নারী অধিকার, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঐতিহাসিক ঘোষণা।

পর্ব

৩৪

বিদায় হজ ও বিদায় ভাষণ

মানবাধিকার, নারী অধিকার, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঐতিহাসিক ঘোষণা

হিজরতের দশম বছর।

ইসলাম তখন সমগ্র আরব উপদ্বীপে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন গোত্র একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিলেন যে, তিনি হজ আদায় করবেন।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য মুসলিম তাঁর সঙ্গে হজ পালনের জন্য মদিনায় সমবেত হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় এক লক্ষেরও বেশি সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এটি ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ হজ, যা হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ) নামে পরিচিত। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮)

মক্কায় পৌঁছে তিনি সাহাবিদের সামনে ধাপে ধাপে হজের বিধান বাস্তবভাবে শিক্ষা দিলেন।

তিনি বলেন,

> «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

অর্থ: "তোমরা তোমাদের হজের বিধান আমার কাছ থেকে শিখে নাও।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২৯৭)

৯ জিলহজ, আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

এই ভাষণ শুধু মুসলিমদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য ন্যায়, সাম্য ও মানবিক মর্যাদার এক চিরন্তন ঘোষণা।

তিনি বলেন,

> "হে মানুষ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান—এগুলো একে অপরের জন্য তেমনই পবিত্র, যেমন এই দিন, এই মাস এবং এই শহর পবিত্র।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৭৪১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৭৯

এর মাধ্যমে তিনি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তাকে ইসলামের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেন।

তিনি জাহিলিয়াত যুগের সকল অন্যায় রীতি বাতিল করে বলেন,

> "জাহিলিয়াত যুগের সমস্ত সুদ (রিবা) বাতিল করা হলো।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮

তিনি রক্তের প্রতিশোধের জাহিলি প্রথাও বাতিল ঘোষণা করেন, যাতে প্রতিশোধের নামে সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি না হয়।

এরপর তিনি নারীদের অধিকার সম্পর্কে বলেন,

> "নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদের গ্রহণ করেছ।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮

তিনি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং পরিবারকে ভালোবাসা, ন্যায় ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে পরিচালনার শিক্ষা দেন।

তিনি মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেন,

> "একজন মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪

তিনি আরও বলেন,

> "কোনো আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের, শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কিংবা কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে।"

এই বক্তব্যটি বিদায় হজের বক্তব্যের অর্থবহ অংশ হিসেবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর মূল শিক্ষা কুরআনের এ আয়াতের সঙ্গেও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ—

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"
>
> — সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩

> এরপর তিনি বলেন,

"আমি তোমাদের মাঝে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না—তা হলো আল্লাহর কিতাব।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮)

আর অন্য একটি বর্ণনায় তিনি বলেন,

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি—আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ। যতক্ষণ তোমরা এ দুটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।" (আল-মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক, হাদিস: ১৬২৮ — অর্থগত বর্ণনা)

ভাষণের শেষে তিনি উপস্থিত সাহাবিদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলেন,

> "আমি কি আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি?"

সকল সাহাবি একসঙ্গে বললেন,

> "জি, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনবার বললেন,

> "হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।"
>
> — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮

এই বিদায় হজেই আল্লাহ তাআলা ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন,

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩)

বিদায় হজ আমাদের শেখায়, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, নারী-পুরুষের অধিকার, অর্থনৈতিক ন্যায়, সামাজিক সম্প্রীতি এবং আল্লাহভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার শিক্ষা রয়েছে।

এটি আরও শেখায়, মুসলিমের জীবনের সর্বোচ্চ পথনির্দেশ হলো আল-কুরআন ও সহিহ সুন্নাহ। এ দুটিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করলেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন সম্ভব।

পরবর্তী পর্বে, ইনশাআল্লাহ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা, শেষ উপদেশ, ইন্তিকাল এবং মানবজাতির জন্য রেখে যাওয়া চিরন্তন আদর্শ।

পর্ব

৩৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা, শেষ উপদেশ, ইন্তিকাল এবং মানবজাতির জন্য রেখে যাওয়া চিরন্তন আদর্শ

বিদায় হজের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় ফিরে এলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নেওয়ার সময় নির্ধারণ করলেন।

হিজরতের একাদশ বছরের সফর মাসের শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি যতদিন সম্ভব নিজেই সালাতে ইমামতি করতেন। কিন্তু অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি নির্দেশ দিলেন—

> "আবু বকরকে বলো, তিনি যেন লোকদের সালাতে ইমামতি করেন।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৮৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪১৮

এ নির্দেশ ছিল আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদা ও নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত।

অসুস্থতার সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের কল্যাণের কথাই বেশি চিন্তা করতেন।

তিনি বারবার সালাতের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তিনি বলতেন,

> «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

অর্থ: "সালাতের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, সালাতের ব্যাপারে সতর্ক থেকো; এবং তোমাদের অধীনস্থদের (অধিকার) সম্পর্কে সচেতন থেকো।" (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৫১৫৬; ইবন মাজাহ, হাদিস: ২৬৯৭)

তিনি আরও সতর্ক করে বলেন,

> "ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লানত; তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৩০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৫২৯

এর মাধ্যমে তিনি উম্মতকে শিরকের সব পথ থেকে সতর্ক করে গেলেন।

একদিন তিনি পর্দা সরিয়ে মসজিদের দিকে তাকালেন।

সাহাবিরা তখন আবু বকর (রা.)-এর ইমামতিতে সালাত আদায় করছিলেন।

এই দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন।

সাহাবিরা মনে করলেন, হয়তো তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন।

কিন্তু সেটিই ছিল তাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখা। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৮০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪১৯)

১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার (তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে সোমবার হওয়া সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত), রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন।

তিনি তাঁর মাথা আয়িশা (রা.)-এর বুকে রেখে আল্লাহর স্মরণ করছিলেন।

শেষ মুহূর্তে তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বললেন,

> «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»

অর্থ: "যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও নেককারদের সঙ্গে... হে আল্লাহ! সর্বোচ্চ সঙ্গী (রফীকুল আ'লা)!" (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪৪৪)

এরপর তিনি ইন্তিকাল করলেন।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সংবাদে সাহাবিদের মধ্যে গভীর শোক নেমে এল।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এতটাই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি।

তখন আবু বকর (রা.) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল মুবারকে চুম্বন করলেন এবং বললেন,

> "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। আল্লাহ আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছিলেন, আপনি তা-ই গ্রহণ করেছেন। এরপর আর কখনো আপনার মৃত্যু হবে না।"
>
> — সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২৪১

এরপর তিনি মসজিদে এসে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন,

> "যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক—মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক—আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।"

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন—

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾

অর্থ: "মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র। তাঁর আগে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তাহলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে?" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪)

(সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২৪১)

এই আয়াত শুনে সাহাবিদের অন্তর স্থির হলো। তারা উপলব্ধি করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়েছে, কিন্তু তাঁর আনীত দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.)-এর ঘরেই দাফন করা হয়—যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৯২)

মাত্র তেইশ বছর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করে তিনি এমন একটি উম্মাহ গড়ে তুলেছিলেন, যারা পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দিয়েছিল।

তিনি মানুষকে শিরক থেকে তাওহীদের দিকে, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে, জুলুম থেকে ন্যায়বিচারের দিকে এবং বিভক্তি থেকে ঈমানের ভ্রাতৃত্বের দিকে আহ্বান করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন আমাদের শেখায়, মানুষের প্রকৃত সফলতা আল্লাহর আনুগত্য, উত্তম চরিত্র এবং তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত।

তাঁর ইন্তিকাল আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়; চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সহিহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে জীবন পরিচালনা করা।

এই ধারাবাহিকের সমাপ্তি।

পরবর্তী ধারাবাহিক, ইনশাআল্লাহ:

খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন | কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে — আবু বকর (রা.) থেকে শুরু করে চার খলিফার যুগ, ইসলামের বিস্তার, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং উম্মাহর জন্য তাঁদের অনন্য আদর্শ।

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

প্রতিটি পর্বে যে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, পর্ব অনুযায়ী সেগুলোর তালিকা।

পর্ব ১ · জাহিলিয়াতের অন্ধকারে আলোর প্রতীক্ষা

- সূরা ইউসুফ, ১২:১০৬
- সূরা আত-তাকভীর, ৮১:৮–৯
- সূরা আল-জুমু'আহ, ৬২:২
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৭

পর্ব ২ · রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশপরিচয়, জন্ম এবং শৈশব

- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৭৬
- সূরা আদ-দুহা, ৯৩:৬
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬২

পর্ব ৩ · তরুণ মুহাম্মাদ ﷺ

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২২৬২
- সূরা আল-কলম, ৬৮:৪
- মুসনাদ আহমাদ; এর অর্থ সহিহ বর্ণনাসমূহ দ্বারা সমর্থিত

পর্ব ৪ · কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ, হাজরে আসওয়াদ স্থাপন এবং হেরা গুহায় নির্জন চিন্তায় নিমগ্ন মুহাম্মাদ ﷺ

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩

পর্ব ৫ · হেরা গুহায় প্রথম ওহি

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩
- সূরা আল-আলাক, ৯৬:১–৫
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬০
- সূরা আল-বাকারা, ২:২

পর্ব ৬ • ওহির বিরতি, "হে চাদরাবৃত!"—নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দাওয়াতের সূচনা

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৯৮২
- সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪:১–৫
- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৬৭
- সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:৩৫

পর্ব ৭ • গোপন দাওয়াতের সূচনা

- সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৬

পর্ব ৮ • সাফা পাহাড়ের আহ্বান

- সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২১৪
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৪
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৯৭১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২০৮
- অর্থগতভাবে সহিহ বর্ণনার সারাংশ
- সূরা আল-মাসাদ, ১১১:১–৩
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৭–৯৯

পর্ব ৯ • কুরাইশদের নির্যাতনের সূচনা

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭৫৭-এর প্রেক্ষাপট এবং নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ
- সীরাত ইবন হিশামসহ নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে বর্ণিত; এর সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে, তবে ঘটনাটি সীরাতে সুপ্রসিদ্ধ।
- সূরা আন-নাহল, ১৬:১০৬
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৮৫৬
- সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:২
- সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৫

পর্ব ১০ • হাবশায় হিজরত

- সীরাত ইবন হিশামসহ নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থে বর্ণিত
- মুসনাদ আহমাদ; সীরাত ইবন হিশাম
- সূরা মারইয়াম, ১৯:১৬ থেকে পরবর্তী আয়াতসমূহ
- সীরাত ইবন হিশাম
- সীরাত ইবন হিশাম; অর্থ কুরআনের সূরা আন-নিসা, ৪:১৭১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

পর্ব ১১ · কুরাইশদের আপসের প্রস্তাব, সূরা আল-কাফিরূন এবং তাওহীদের প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবিচল অবস্থান

- সূরা আল-কাফিরূন, ১০৯:১–৬
- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৪–৯৫
- সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৭

পর্ব ১২ · সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩১৮৫; নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ
- সূরা আল-বাকারা, ২:২১৪
- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সূরা আশ-শারহ, ৯৪:৫–৬

পর্ব ১৩ · শোকের বছর

- সীরাত ইবন হিশাম; আল-মু'জামুল কাবীর
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২৩১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯৫
- সূরা আল-জিন, ৭২:১–২
- সূরা আল-আহকাফ, ৪৬:২৯–৩২

পর্ব ১৪ · ইসরা ও মি'রাজ

- সূরা আল-ইসরা, ১৭:১
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬২
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৪
- সূরা আন-নাজম, ৫৩:১৮
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৪৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬২
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৪৯
- মুসনাদ আহমাদ; আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম

পর্ব ১৫ · ইয়াসরিবের নতুন আশা

- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৮৯২
- মুসনাদ আহমাদ; সীরাত ইবন হিশাম
- সূরা আন-নিসা, ৪:১০০

পর্ব ১৬ · হিজরতের সূচনা

- সূরা আল-আনফাল, ৮:৩০
- সীরাত ইবন হিশাম; তাফসির ইবন কাসির, সূরা ইয়াসীনের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহের আলোচনায়
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯০৫
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৬৫৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৩৮১
- সূরা আত-তাওবা, ৯:৪০

পর্ব ১৭ · মদিনায় আগমন

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯০৬
- সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৮
- সুনান আত-তিরমিযী, হাদিস: ৩২৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস: ১৪১২ — সহিহ
- সীরাত ইবন হিশাম; মুসনাদ আহমাদে অর্থগত সমর্থন রয়েছে
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৮৩৪; সহিহ মুসলিম
- সূরা আল-আনফাল, ৮:৬৩

পর্ব ১৮ · মুহাজির ও আনসারের ভ্রাতৃত্ব, মদিনা সনদ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন

- সূরা আল-হাশর, ৫৯:৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২০৪৮
- সীরাত ইবন হিশাম; ইবন কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০

পর্ব ১৯ · কিবলা পরিবর্তন, রমজানের রোজা ফরজ এবং বদরের যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি

- সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৪
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪৮৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৫২৫
- সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৩
- সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৫
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৭৬০
- সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৯

পর্ব ২০ · বদরের যুদ্ধ

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৯
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৯; সীরাত ইবন হিশাম
- সীরাত ইবন হিশাম

- সূরা আল-আনফাল, ৮:১১
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৩
- সূরা আল-আনফাল, ৮:৯
- সূরা আল-আনফাল, ৮:১০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৬৫
- সূরা আল-আনফাল, ৮:১৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৬২–৩৯৬৪
- সূরা আল-আনফাল, ৮:৪১

পর্ব ২১ · বদরের পরিণতি

- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৩
- মুসনাদ আহমাদ; সীরাত ইবন হিশামে এর উল্লেখ রয়েছে
- সূরা আল-আনফাল, ৮:৭০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩০০৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৫৬১; সহিহ মুসলিম
- সূরা আল-আনফাল, ৮:২৭
- সূরা আলে ইমরান, ৩:২০০

পর্ব ২২ · উহুদের যুদ্ধ

- সহিহ আল-বুখারি; সীরাত ইবন হিশাম
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৭; সহিহ আল-বুখারি
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৪৩
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৭৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯০
- অর্থগতভাবে সহিহ হাদিসে বর্ণিত। সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৪৭৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৯২
- সহিহ আল–বুখারি, হাদিস: ৪০৭২
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫২

পর্ব ২৩ · উহুদের পরবর্তী ঘটনা

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৪৩, ২৮০৩
- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৪

- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৭

পর্ব ২৪ · বানু নাদিরের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের নির্বাসন এবং মদিনার নিরাপত্তা রক্ষায় রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৩১; সীরাত ইবন হিশাম
- সূরা আল-হাশর, ৫৯:১১–১২
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০২৮–৪০৩৩
- সূরা আল-হাশর, ৫৯:৬
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪০৩৩
- সূরা আল-হাশর, ৫৯:৮
- সূরা আল-হাশর, ৫৯:৯

পর্ব ২৫ · খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব)

- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১০৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮০৩
- মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ১৮৭৫৭ — অর্থগতভাবে; আল-হাকিম
- সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১০–১১
- সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১২
- সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২২
- সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১১০

পর্ব ২৬ · বানু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গ, তাদের বিচার এবং মদিনায় অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের অবসান

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১১৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৯৪৬
- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১২১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৬৮
- সহিহ আল–বুখারি, হাদিস: ৩৮০৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪৬৬

পর্ব ২৭ · হুদাইবিয়ার সন্ধি

- সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১৫২; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮৩
- সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১৮
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৬৯৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮৩

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৭৩১
- সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:১

পর্ব ২৮ • খাইবার বিজয়

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪১৯৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮০২
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৯৪৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৬৫
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৭০১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০৬
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪০৬
- সহিহ আল–বুখারি, হাদিস: ২৩২৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৫৫১
- সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৫২১৮; হাসান

পর্ব ২৯ • বিশ্বের শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত

- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৮
- সূরা সাবা, ৩৪:২৮
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৫৮৭২
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৬৪
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৩
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪২৪
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৩১৫
- মুসনাদ আহমাদ; ইবন হিব্বান
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৩৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৯৫১

পর্ব ৩০ • মু'তার যুদ্ধ

- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৬১
- সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭৬৩; হাসান-সহিহ
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৬২

পর্ব ৩১ • মক্কা বিজয়

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৭৩১; ইবন হিশাম
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৭৭
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮০
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৮৬

- আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন, ইমাম হাকিম, হাদিস: ৪৩৬৫
- সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮১
- সূরা সাবা, ৩৪:৪৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪২৮৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৮১
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৩৯৭
- সীরাত ইবন হিশাম; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ। অর্থটি সূরা ইউসুফ, ১২:৯২-এর ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পর্ব ৩২ · হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অভিযান

- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৫৯; সীরাত ইবন হিশাম
- সূরা আত-তাওবা, ৯:২৫
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৫
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ২৮৬৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৭৫
- সূরা আত-তাওবা, ৯:২৬
- সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৯৪২; হাসান
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৩৩০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০৬১

পর্ব ৩৩ · তাবুক অভিযান

- সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৭
- সুনান আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৭০১; হাসান
- সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ১৬৭৮
- সূরা আত-তাওবা, ৯:৯২
- সূরা আত-তাওবা, ৯:৮১
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪১৮
- সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৮
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪১৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৬৯

পর্ব ৩৪ · বিদায় হজ ও বিদায় ভাষণ

- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮
- সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১২৯৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৭৪১; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৭৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৬৪
- সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩
- আল-মুওয়াত্তা, ইমাম মালিক, হাদিস: ১৬২৮ — অর্থগত বর্ণনা

- সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩

পর্ব ৩৫ • রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর অসুস্থতা, শেষ উপদেশ, ইন্তিকাল এবং মানবজাতির জন্য রেখে যাওয়া চিরন্তন আদর্শ

- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৮৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪১৮
- সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৫১৫৬; ইবন মাজাহ, হাদিস: ২৬৯৭
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১৩৩০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৫২৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৬৮০; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪১৯
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ৪৪৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৪৪৪
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস: ১২৪১
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪
- সহিহ আল–বুখারি, হাদিস: ১৩৯২
- সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর জীবন

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

সংকলন ও সম্পাদনা: ইহছানুল হক ছাজিদ